বঙ্কিমচন্দ্র।

(কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর)

“তোমারি চরণ স্মরণ করিয়ে চলেছি তোমারি পথে
তোমারি ভাবেতে দেখিব তোমায় ধরি এই মনোরথে।”

হেমচন্দ্র।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং নীলমাধব সেনের লেন,
বণিক যন্ত্রে
এ, জি, সেনের দ্বারা মুদ্রিত।

ভাদ্র, ১২৯৩।

ভূমিকা।

কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাইতে হইলে, ভক্তি-ভাবে তাঁহার প্রতিভার বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিতে হয়। যিনি ধার্ম্মিক, ভক্তিভাবে তাঁহার মানসিক বৃত্তিগুলির সহিত বাহিরের ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিলেই,তাঁহার ধর্ম্মভাবের সম্যক্ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে; যিনি কবি, ভক্তিভাবে তাঁহার কাব্যগুলি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিলেই,তাঁহার কবিত্বের যথাযথ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এই কথাটি অনেকদিন আমরা বিস্মৃত ছিলাম, তাই আমরা অনেক বিষয়ে পূর্ব্বে বড়ই ভুল বুঝিয়াছি। আজ যেমন করিয়া আমাদিগের চিন্তাশীল আর্য্যসন্তানগণ পুরাকালের আর্য্যশাস্ত্রাদি আলোচনা করিতেছেন, যদি চিরদিনই তাঁহারা এইরূপই করিতেন, তাহা হইলে এমন সুনিবদ্ধ গভীর হিন্দুধর্ম্ম কখনও ভ্রমসঙ্কুল জঘন্য পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া লোকের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিতে পারিত না। শুদ্ধ, প্রাচীনতম শুদ্ধসত্ব স্থিরদর্শী পরম-জ্ঞানী আর্য্য-ঋষিদিগের প্রতি সম্যক্ ভক্তির অভাবেই হিন্দুধর্ম্মের সমালোচকগণ এত প্রমাদাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জ্ঞান ছিল, জ্ঞান কর্ম্মে পরিণত করিবার ইচ্ছা-চেষ্টাও ছিল, কিন্তু ভক্তি ছিল না—তাঁহারা পূর্ব্বতন মহর্ষিগণকে স্বার্থপর ইত্যাদি ভাবিয়া যেন একটু ঘৃণাই করিতেন। এই ঘৃণাই ভারতের ধর্ম্মোন্নতিকে কিছু শিথিল-পদ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা জ্ঞানী ছিলেন, এ কথা আমরা স্বীকার করিতেছি, অথচ তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত সমালোচক বলিতেছি, ইহা যেন একটু অসংলগ্ন বোধ হয়। বাস্তবিক ইহা কিছুমাত্র অসংলগ্ন নহে—আমরা তাহা বিশদ করিয়া দেখাইতেছি। মনে কর, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি তোমার সমকক্ষ মনে করিতেছ; কিন্তু রামচন্দ্র বাস্তবিক তোমা অপেক্ষা ঢের বেশি পড়িয়াছেন, চিন্তা করিয়াছেন, ভূয়োদর্শিতা লাভ করিয়াছেন ও তদর্থে ঢের চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। রামচন্দ্রের মত লোক এখন আর দেখা যায় না—এখন যাঁহাদিগকে খ্যাতি-

মান দেখ, কার্য্য দেখিয়া যাঁহাদিগকে খ্যাতিমান মনে কর, তাঁহারা ঠিক রামচন্দ্রের মত নহে। তুমি রামচন্দ্রের একটি মত শুনিলে; শুনিয়া এখনকার খ্যাতিমান লোকদিগের মতের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে; যখন দেখা গেল যে, রামচন্দ্রের মতটি আর প্রচলিত মতটি ঠিক এক নহে, তুমি রামচন্দ্রের মতটি ভুল বলিয়া একটু হাসিয়া ফেলিয়া রাখিবে—আর কোনও অনুসন্ধান, অনুশীলন আবশ্যক মনে করিবে না। কিন্তু যদি তুমি এরূপ মনে কর যে, রামচন্দ্র একজন জ্ঞানী লোক, তোমা অপেক্ষা তাঁহার জ্ঞান অধিক বেশি, তাঁহার জ্ঞানে তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তবে তুমি ওরূপ করিয়া ফেলিয়া রাখিবে না। তুমি ঐটি একবার, দুইবার, দশবার চিন্তা করিতে থাকিবে। যদি রামচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে তোমা অপেক্ষা জ্ঞানী হয়েন, এই রূপে তুমি তাঁহার পরিচয় পাইতে পার। জ্ঞানী না হইলেও ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সমকক্ষ বলিয়া ভাবিলে, প্রথম দৃষ্টিই সিদ্ধান্তে পরিণত হয়, গুণগুলি লুক্কায়িত থাকে, দোষই বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। গুণের পরিচয় পাইলে, তাহা নিজেরই গুণ বশতঃ ভাবিতে ইচ্ছা করে, প্রকৃত প্রকাশককে সে গৌরব দিতে ইচ্ছা হয় না। ভক্তি ও তদভাব আমাদিগের অন্য-সম্বন্ধীয় মতগুলিকে এইরূপ নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রায় এইরূপ কারণ বশতঃই সমকালীয় লেখকগণ সেই কালের প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া থাকেন না। সেক্ষপিয়র যে তাঁহার সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ না করিয়াছিলেন এমত নহে, তবে সে খ্যাতিটি—গুণগ্রাহিতাটুকু কিছু অসম্পূর্ণ ছিল। সমকালীয় লোক দ্বারা অতি অল্প লোকেরই গুণ সম্যক্ গৃহীত হইয়া থাকে। ভক্তির অভাবই ইহার মুখ্য কারণ। ভক্তির অভাব নানা কারণে হইতে পারে। যাহাকে ভালরূপ জানি বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহাকে অতি অল্প স্থলেই আমরা ভক্তি করিয়া থাকি—যাহাকে জানি না, তাহারই গুণে বিশ্বাস অধিকতর, সুতরাং যদি তৎপ্রতি কোনও কারণে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহা সমধিক গাঢ়। সমকালীয় লোক এই জন্যই বোধ হয় পরস্পরকে ভক্তি কম করে। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের আরও একটি দোষ আছে। আমরা কোনও দ্রব্য অখণ্ড ভাবে যেরূপ দেখিতে পারি, পরীক্ষা করিতে পারি, তাহার খণ্ড গুলি ধরিয়া তত পারি না। সমগ্র মনুষ্যটিই আমাদিগের পরীক্ষার বিষয় হইয়া

উঠে, কিন্তু তাহার পৃথক্ পৃথক্ ভাবগুলিকে সমগ্র করিয়া দেখিতে, ব্যষ্টিকে সমষ্টি করিয়া দেখিতে, আমরা ততদুর সমর্থ হই না। মানুষ আবার সব দিকে সমান প্রায় দেখা যায় না। এইরূপ স্থলে, যে ভাব পরীক্ষা করিতে বসিয়াছি, যদি আমি সেই ভাবে ভাবুক মনুষ্যটিকে তন্ময় মনে না করি, এতদেতর ভাবগুলি বিস্মৃত হইতে না পারি, তবে সে পরীক্ষার ফল ভাল হয় না। সমকালীয় সমালোচকগণ, বিশেষতঃ যাঁহাদিগের সহিত গ্রন্থকারের কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকে, তাঁহারা এইরূপ খণ্ডকে সমগ্র ভাবিতে পারেন না। তাঁহারা কাব্য ভাবিতে ভাবিতে মানুষটিও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়া থাকেন। গ্রন্থকারের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধের এইরূপ ফল অনিবার্য্য। এই সকল কারণে এখনকার বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল সমালোচকগণ কর্তৃক বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির উপযুক্ত সমালোচনা পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন। ইহাঁরা নব্যতর সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাঁদিগের মধ্যে ভক্তির ভাব আছে, কিন্তু বিজ্ঞ, বহুদর্শী, প্রবীণ সমালোচকগণের ন্যায় জ্ঞানটি নাই। যদি ইহাঁদিগের এই ভক্তিটুকু কোনও রকমে এই সমালোচকদিগের হইতে পারিত, অথবা এই সমালোচনী প্রতিভা যদি ইহাঁদিগের থাকিত, তবেই আমরা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলীর প্রকৃত সমালোচনা দেখিতে পাইতাম।

নবেল বা উপন্যাস দ্বিবিধ—ভাবমুলক ও ঘটনামূলক। বিবিধ প্রকার বাহ্যিক ঘটনার সহিত আমাদিগের মানসিক ভাব-সমূহের সম্বন্ধ স্ফুটতর করিয়া, যাহাতে আমাদিগকে বাহ্যিক-ঘটনা-শাসনক্ষম মনোবৃত্তিগুলি অনুশীলন করিবার আবশ্যকতা প্রদর্শন করে,তাহাকে আমরা ভাবমূলক উপন্যাস বলি। ইহার প্রধান বিষয় মন—ভাব ও জ্ঞান। ঘটনাগুলি ইহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার। ঘটনার সৃষ্টি মন বুঝাইতে। ঘটনা ইহার চিত্রপট—মন ইহার আলেখ্য। আমাদিগের বঙ্গীয় লেখককুল-গৌরব বঙ্কিম বাবু এই শ্রেণীর উপন্যাস-লেখক। আর এক শ্রেণীর উপন্যাসে প্রধান বিষয় ঘটনা। কার্য্য বিষয় হইলে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসঙ্গে আনুষঙ্গিক বিষয় হইয়া পড়ে। ইহাতে শিক্ষা প্রদান করে, কিরূপে কার্য্য করিলে আমরা বেশ স্বচ্ছন্দে ও সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারি—বিপদকে অনায়াসে পায়ে ঠেলিয়া, দরিদ্রতাকে তুচ্ছ করিয়া, সংসারে পদস্থ ও সুখী হইতে পারি। ইংলণ্ডে এই শ্রেণীস্থ উপন্যাসই প্রথম সৃষ্ট হয়।

ভাব-প্রধান আর্য্যভূমে, বিশুদ্ধ ঘটনামূলক উপন্যাস বড় একটা দেখিতে পাই না—নাই বলিলেও চলে।*

নৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়িয়া বলিলে, মনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র পরমাণু (যদি এইরূপ কথা বলিতে পারা যায়) আণবিক যন্ত্রে বড় করিয়া দেখিয়া, যিনি তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইতে পারেন, তিনিই ভাবমূলক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠতম লেখক। আমরা বাহিরে যে ভাবগুলি স্ফুটতর দেখিতে পাই, তাহা ঐ পরমাণুগুলির সামান্য বা রাসায়নিক মিশ্রণ মাত্র। প্রকৃত কবি আমাদিগকে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ইহার প্রত্যেক পরমাণুর প্রকৃতি দেখাইয়া থাকেন। এক রকম বুঝিয়া দেখিলে, নীতি প্রভৃতি সমস্তই ইহার মধ্যে নিহিত আছে। ইহাই রোগ-পরীক্ষা, রোগ-নির্ণয় ও রোগ-নিদান—শেষে মাত্র ইহার চিকিৎসা-ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমরা ভক্তি সহকারে বঙ্কিমবাবুর নবেলগুলি পড়িয়া, ইহাতে তাঁহার মিশ্রভাব-বিশ্লেষণী ক্ষমতার এত পরিচয় পাইয়াছি যে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে গেলে, লোকে পাগল বলিবে। জর্জ্জ ইলিয়টের নবেল ভিন্ন প্রায় অন্য কোনও ইংরাজী নবেল ইহার সমকক্ষ ভাবে দাঁড়াইতে পারে না।

বঙ্কিমবাবুর এই উপন্যাসগুলি সর্ব্বত্রই পঠিত হইয়া থাকে। কি তরুণ-মতি বালক, কি অর্দ্ধশিক্ষিতা কামিনী, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসাবলী সকলেরই নিকট আদরের সামগ্রী। কিন্তু এগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি কোনও প্রকারে তাহাদিগকে এই মনোহর উপন্যাসগুলি সম্যক্ বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাদিগের কিছু উপকার হইতে পারে। উপন্যাস যদি পাঠ করিতে হয়, তবে তাহা বুঝিয়া পড়া উচিত। শুদ্ধ গল্পের ন্যায় উপন্যাস পড়িলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন, তাঁহারা উপন্যাস বুঝিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও উপন্যাস বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে, ভাল করিয়া উপন্যাস বুঝিতে যেটুকু অনুসন্ধান চাই ও পরিশ্রম চাই, তাহা তাঁহারা করিতে রাজি নহেন। আরও একটি কারণ আছে। তাঁহারা বাঙ্গালা উপন্যাসের প্রতি তত শ্রদ্ধাযুক্ত নহেন। যাহাতে এই শ্রেণীর পাঠকবর্গ বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি ভক্তির সহিত পাঠ করিতে যত্নশীল হয়েন, আমরা

---

* বঙ্কিম বাবুর 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আনন্দমঠ' কতক এই শ্রেণীর নবেল বলিতে পারা যায়।

তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছি। এই জন্যই আমরা বঙ্গীয় লেখককুল-গৌরব পরম প্রতিভাশালী বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারই নামে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা যেরূপ করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমরা "বঙ্কিমচন্দ্র"এর বর্ত্তমান খণ্ডে বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'চন্দ্রশেখর' এই দুইখানি উপন্যাসের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিলাম। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসগুলি ক্রমশঃ খণ্ডাকারে এই ভাবে সমালোচিত হইবে। পরিশিষ্টে আমরা তাঁহার অনুমতি লইয়া,তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নাতি-ক্ষুদ্র জীবন-চরিত সংযোজনা করিয়া দিব,এইরূপ মানস করিয়াছি। জীবন-চরিতে আমরা তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি ও চেষ্টা করিয়া যাহা কিছু জানিতে পারিব, সমস্তই উল্লেখ করিব। তাঁহার উপন্যাস লেখা সম্বন্ধে অনেকগুলি আশ্চর্য্য কথা আছে, আমরা সাধ্যানুসারে তাহাও পাঠকবর্গকে জানাইতে ভুলিব না। তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে আমরা তদীয় অগ্রজ, সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সহায়তার ভরসা রাখি। আর, বঙ্কিমবাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারি চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়দ্বয় আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পুস্তক লেখা সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা 'নবজীবন'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও জ্ঞাত আছেন, তিনি আমাদিগকে তাহা বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সম্ভব হইলে, আমরা স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকটও দুই এক কথা জানিয়া লিখিতে পারি। ফল কথা, এ সম্বন্ধে যতদূর চেষ্টা আবশ্যক, তাহাতে ত্রুটি হইবে না। পরিশিষ্টে আরও একটি বিষয় থাকিবে। সেটি ইংরাজী ও বাঙ্গালা নবেলের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস। এই ইতিহাস উপলক্ষে আমরা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলি তুলনায় সমালোচনা করিয়া তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখাইব।

পুস্তকখানি যে কত বড় হইবে, তাহা এখনও বলিতে পারিতেছি না। সকলগুলি একত্রে লইতে ক্রেতৃগণের কিছু অসুবিধা হইতে পারে, এই বিবেচনায় গ্রন্থখানি খণ্ডাকারে প্রকাশ করিলাম। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা,

সেইরূপই ক্রয় করিতে পারিবেন। মূল্যও যত অল্প হইতে পারে, সমগ্র গ্রন্থের জন্য তাহাই স্থির হইবে—খণ্ডগুলি পৃথক্ ভাবে কিনিলে চলিত-দরে কিনিতে হইবে।

যে সাহসে নির্ভর করিয়া আমরা এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাও উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি। সুবিখ্যাত সমালোচক, 'শকুন্তলা-তত্ত্ব'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু,—চিন্তাশীল, সুলেখক, 'নবজীবন'-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়দ্বয় অতি যত্ন-সহকারে গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিতেছেন। তাঁহা-দিগকে আমরা যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি, তাঁহারাও সেইরূপই স্নেহ-সহকারে আমাদিগের এ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। এ গ্রন্থখানি কিসে সুন্দর হইবে, তৎপ্রতি আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগেরও দৃষ্টি আছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে ও সানন্দে আমরা আরও একটি কথা বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিব। আমরা এইরূপ গ্রন্থ বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়া পরম ভক্তিভাজন মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি যেরূপ উত্তর লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। আমরা এই গ্রন্থের কতকাংশ লিখিয়া চন্দ্র বাবুকে পড়িতে দিই, এবং বঙ্কিম বাবুর ইচ্ছা হইলে এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মত জানিয়া আমাদিগের পত্রের উত্তর লিখিতে পারেন, তাঁহার নিকট এইরূপ লিখি। কিন্তু তিনি আমাদিগের পত্রের যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিকই আমরা নিতান্ত উৎসাহিত হইয়া এ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থের সমালোচনায় তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে, আমাদিগের অহঙ্কার হইবারই কথা। আমরা যদি তাঁহারই অভিলাষমত তাঁহার গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা করিতে পারি, তবেই আমাদিগের সকল উদ্দেশ্য সফল হইবে। কারণ, গ্রন্থ-সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যাখ্যাই আমাদিগের পুস্তকের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বঙ্কিম বাবুর পত্র।

"সাদর সম্ভাষণম্—

"আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। কেবল এই কথা, যে

আমার প্রণীত নরনারী-চরিত্রগুলি আপনাদিগের এতদূর পরিশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ।

"তবে, আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা আশার অতীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি।

"আমার পুস্তক হইতে যেখানে যতদূর উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করিবেন, তাহা করিবেন। তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

"পুস্তকের নাম যাহা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি হইতে পারে না।

"আমি চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেননা আপনার বিচার-শক্তির পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

" 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্দ্ধেক মাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, আমাকে কিছু দিনের জন্য কলিকাতা হইতে অতিদূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।

"চন্দ্র বাবু ও অক্ষয় বাবু আপনার সহায়তা করিবেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। * * * ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ্য।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"

উপসংহারে একটি কথা পুনর্ব্বার বলিয়া রাখি। যাঁহারা সমালোচনা অর্থ 'প্রশংসিত রূপে নিন্দা' মনে করেন, তাঁহারা আমাদিগের এ গ্রন্থ ক্রয় করিবেন না। আমাদিগের এ গ্রন্থে সেরূপ সমালোচনা নাই—আমাদিগের এই সমালোচনা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা মাত্র। তাঁহারই ভাবে যদি আমরা গ্রন্থগুলি দেখিতে ও দেখাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহাতে নিন্দার কথা আসিতেই পারে না। এই কথাটি পাঠকবর্গের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।
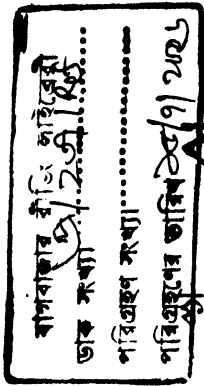
বঙ্কিমচন্দ্র।

কৃষ্ণকান্তের উইল।
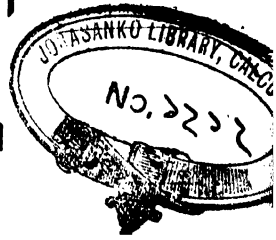
ইতিবৃত্ত।

এই উপন্যাস খানি বাঙ্গালা ১২৮২ সালের পৌষ মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হয়। সমগ্র নহে—মাসিক-পত্রে যেরূপ ২।৩টি পরিচ্ছেদ করিয়া একবারে প্রকাশিত হয়, ইহাও সেইরূপ হইতেছিল। যখন ইহার নবম পরিচ্ছেদ লেখা সমাপ্ত হয়, 'বঙ্গদর্শন' কাগজ খানি উঠিয়া গেল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সমস্তটা তখনও লেখা হইয়াছিল না, সুতরাং তাহা শীঘ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল না। ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাসে "বঙ্গদর্শনের" পুনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও বাহির হইল। ক্রমে ২।৩টি পরিচ্ছেদ করিয়া ১২৮৪ সালের মাঘ মাসে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শেষ হয়। ইহার পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবু ৬খানি নবেল লিখিয়াছিলেন—'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাঁহার সপ্তম সৃষ্টি।

১২৮৫ সালে ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। ইং ১৮৮২ সালে ইহার পুনঃ সংস্করণ হয়। প্রথম সংস্করণে ১০০০ কাপি বই ছাপা হইয়াছিল; এখনও ইহার তৃতীয় সংস্করণ হয় নাই। ইহা দেখিয়া যদি সাধারণের এতদুপরি শ্রদ্ধা পরিমাণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে, বঙ্কিম বাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি অপেক্ষা ইহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কম। এইখানে আমরা ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোনও পরিচ্ছেদ একেবারে নূতন আকারে বাহির হইয়াছে, যথা প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ, আর কতকগুলি অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনের প্রধান বিষয়ই রোহিণী-চরিত্র। রোহিণী প্রথম সংস্করণ হইতে

দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু পরিশোধিতা হইয়া বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণের কতকটা পরিশোধিত হইলে গ্রন্থকারের কলিকাতা হইতে অনেক দূরে যাইতে হয়, সুতরাং ইহার শেষাংশ ভালরূপে সংশোধিত হইতে পারে নাই। তাই, স্থানে স্থানে পূর্ব্বাংশের সহিত শেষাংশের অনৈক্য দৃষ্ট হয়। যথা ৩৫ পৃঃ, "অতএব অর্থলোভে রোহিণী", এখানে 'অর্থলোভে' কথাটির সহিত পূর্ব্ব ঘটনার ঐক্য নাই। যাহা হউক এরূপ স্থল অতি অল্প। দ্বিতীয় সংস্করণে আরও একটি পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এবারে ইহা দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। গোবিন্দলালের ভ্রমর-ত্যাগ অবধি ইহার দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ। পুস্তকখানির বর্ত্তমান মূল্য—৸৵০, পুস্তক-বিক্রেতাগণ প্রায় সকলেই বঙ্কিম বাবুর পুস্তক রাখিয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে তাৎকালিক সাময়িক-পত্রের মতগুলি আমরা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই জন্য তাহা এবারে গ্রন্থ শেষেই দিবার মনন রহিল। কালে ইহা জানিবার জন্য আবশ্যক বোধ হইতে পারে।

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

"কৃষ্ণকান্তের উইল"এ, তিনটিই প্রধান চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। (১) গোবিন্দলাল, (২) ভ্রমর, (৩) রোহিণী। আমরা যথাক্রমে ইহাদিগের চরিত্রগুলি কিছু বিস্তৃতরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, আনুষঙ্গিক অন্যান্য চরিত্রগুলিও সমালোচনা করিব।

১। গোবিন্দলাল।

প্রত্যেক কার্য্যেই একটা সুনিবদ্ধ শৃঙ্খলা অবলম্বন করিলে, কার্য্যসম্পাদন কিছু সহজে হইয়া থাকে। আমরা সেই জন্য গোবিন্দলালের জীবনটিকে কয়েকটি পৃথক্ ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলাম। গোবিন্দলালের জীবনের প্রধান ভাব তিনটি—রোহিণী-প্রসক্তি, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি, ভ্রমরানুরাগ। এই তিনটি আভ্যন্তরিক ভাব, বাহ্যিক অবস্থাবিশেষে তাঁহার জীবনাঙ্কগুলিতে কিরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিল, আমরা প্রথমে তাহাই দেখাইব। এতদ্ভিন্ন আর যে দুই এক কথা বলিতে হইবে, তাহা শেষে বলিব। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের এই শৃঙ্খলাটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি

রাখিবেন। আমাদিগের বিভক্ত অধ্যায় ও বর্ণিত ভাবগুলির প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, প্রবন্ধ পড়িবার কালে কিছু অসংলগ্ন বোধ হইবে।

প্রথম অধ্যায় ঃ—যে দিন গোবিন্দলাল রোহিণীর মুখে শুনিতে পাইলেন যে, রোহিণী তৎপ্রতি অনুরক্তা, সেইদিনই তাঁহার জীবন-নাটকের প্রথমাঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল। গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে সেই ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমদিগের বর্ত্তমান অধ্যায়ে অন্তর্নিবিষ্ট।

গ্রন্থের প্রারম্ভে রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। রোহিণী গোবিন্দলালের প্রতিবাসিনী মাত্র। গ্রন্থ-মধ্যে রোহিণীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ একদিন বৈকাল বেলা, তাঁহাদের বারুণী-ঘাটে। রোহিণী তখন ঘাটে বসিয়া বড় কাঁদিতেছিল। গোবিন্দলাল সহৃদয়, পরের দুঃখ দেখিয়া কিছু ব্যথিত হইলেন—রোহিণীর প্রতি তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। এখন পর্য্যন্ত আসক্তির কোন প্রসঙ্গই নাই, শুধু দয়া। এই দয়া শেষে কিরূপে সহানুভূতিতে পরিগণিতা হইয়া আসক্তিতে পরিণতা হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। এখানে কেবল একটি কথা বলিয়া রাখিতে হইবে। রোহিণী যখন অপরাধি-ভাবে ধৃতা হইয়া কৃষ্ণকান্ত-সমীপে আনীতা হইল, গোবিন্দলাল রোহিণীর এ অসৎ কার্য্যটি বিশ্বাস করিলেন না। রোহিণীর প্রতি তাঁহার এই বিশ্বাসটি তাঁহার জীবনের প্রথম অধ্যায়েই সঞ্জাত হয়। যেরূপ প্রমাণাদি ছিল, তাহা সত্ত্বেও যে, গোবিন্দলাল প্রবীণ কৃষ্ণকান্তের ন্যায় তাহাকে চোর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাহার একটি অতি গূঢ় কারণ, বারুণী-তটে গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর সেই দিনকার ঘটনা। রোহিণী সুন্দরী, যুবতী। সে রূপ দেখিয়া গোবিন্দলাল মুগ্ধ হন নাই সত্য, কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহার একটি ভাল ধারণা জন্মিয়াছিল। ইহা রূপের একটি সাধারণ ধর্ম্ম। আর, রোহিণী সে দিন গোবিন্দলালের সহিত আলাপে হৃদয়ের একটুকু এমনই ভাব দেখাইতে পারিয়াছিল যে, তাহার রূপরাশির সহিত যুক্ত হইয়া তাহা গোবিন্দলালের নিকট এরূপ অপবাদের একটি অতি বিরুদ্ধ প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল নিজে সাধু-স্বভাব, ধার্ম্মিক,—অবিশ্বাসের বিশেষ কোন কারণ না পাইয়া কেবল লোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া রোহিণাকে অবিশ্বাস করিতে অসম্মত। ইহাও একটি প্রকাশিত কারণ বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণটিও ইহার মধ্যে গূঢ় ভাবে নিহিত আছে। গোবিন্দলালের অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই।

গোবিন্দলালের সহিত প্রথম সন্দর্শন-দিবসেই আমরা দেখিতে পাই, গোবিন্দলাল ধার্ম্মিক, আত্মসংযম-পরায়ণ ও সহৃদয়। রোহিণীকে বারুণীর ঘাটে বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়া গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক এও সেই জগৎ-পিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ, অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?'

গোবিন্দলাল বড় সাবধান পুরুষ। একাকিনী অবস্থিতা যুবতী রমণীর নিকট যাইতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার করুণ হৃদয় সম্যক্ আর্দ্রীভূত হয় নাই, তাই তাঁহাকে ঐরূপ বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইল যে, রোহিণীর নিকটে তাঁহার যাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু রোহিণীর কাছে গিয়া তিনি কিছু বেশি দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন। রোহিণীর দুঃখ দূর করিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল—তিনি তৎপ্রতিপালনে রোহিণীর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন।

এতদ্দ্বারা আমরা কয়েকটি তত্ত্ব অতি জ্বলন্ত অক্ষরে পড়িতে পাইলাম। কবির এইত কৌশল, এইত শিল্প-চাতুর্য্য! আমরা দেখিতে পাইলাম, গোবিন্দলাল আত্মসংযমে সর্ব্বদা সচেষ্ট। এ সম্বন্ধে তাঁহার খুব সতর্কতা আছে। তিনি একাকী অজ্ঞাত-চরিত্রা, সুন্দরী, যুবতী, রমণীর নিকটে যাইতে প্রথমে একটুকু সঙ্কুচিত হইলেন,—কি জানি পাছে স্ত্রীলোকটি দুশ্চরিত্রা হয়। একে সুন্দরী যুবতী, তাহাতে দুশ্চরিত্রা, আত্মসংযমে সচেষ্ট যুবকের নিকট সঙ্কোচের জিনিসই বটে। দেখিতে পাইলাম, গোবিন্দলাল ধার্ম্মিক—তিনি আপনার কথা ভুলিয়া গিয়া রোহিণীর দুঃখ নিবারণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কারণ রোহিণী ও তিনি সেই এক জগৎ-পিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ। দেখিতে পাইলাম, গোবিন্দলাল সহৃদয়—রোহিণীর দুঃখে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তিনি রোহিণীর নিকটে আসিয়া আনত বদনে (তিনি রোহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন না) "স্বচ্ছ সরোবর জলে সেই ভাস্কর-কীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ।" গ্রন্থকারের এই কথাগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে ৩।৪ পাতা করিয়া লিখিবার বস্তু আছে। এরূপ বিস্তৃত

সমালোচনা এরূপ ভাবে সম্ভবপর নহে, সুতরাং কষ্ট পাইয়াও আমাদিগকে অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। "সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর!" "সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ।" এই দুইটি কথা শুনিয়াই আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, গোবিন্দলাল হৃদয়বান্ ব্যক্তি। বঙ্কিম বাবু দুই এক কথায় আমাদিগকে এতগুলি বুঝাইয়া দিলেন। যে শ্রেণীর সমালোচনায় কাব্য বা কবির প্রশংসারই বাহুল্য থাকে, আমাদিগের এই সমালোচনা যদি সেই শ্রেণী ভুক্ত হইত,তবে সাধুভাষায় সুললিত পদ-বিন্যাস করিয়া এখানেই আমরা গোবিন্দলাল ও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় ২।৩ পাতা ব্যয়িত করিতাম। কিন্তু আমাদিগের উদ্দেশ্য কিছু স্বতন্ত্র প্রকৃতির—চরিত্র-বিশ্লেষণই আমাদিগের লক্ষ্য, সুতরাং আমরা সে সম্বন্ধে কোথায়ও বেশি কথা বলিব না। দুই একটি কথা যদি আসিয়া পড়ে, পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

আমরা গোবিন্দলালের চরিত্রে আরও একটু বিশেষ গুণ দেখিতে পাইলাম। গোবিন্দলালের ধারণা ও ব্যবহার (theory & practice) একই প্রকৃতির। তিনি কেবল মনে মনেই ধার্ম্মিক নহেন। এরূপ অনেক লোক আছেন, যিনি মনে মনে বাস্তবিকই সাধু, কিন্তু মনোভাব কার্য্যে পরিণত করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এরূপ জড়-প্রকৃতির (of passive character) ধার্ম্মিক লোক আমাদিগের মধ্যে বিরল নহে। গোবিন্দলাল রোহিণীর দুঃখ দূরে যেমন ইচ্ছুক, তৎসাধনেও তেমনই কার্য্য-তৎপর। তিনি রোহিণীকে এখন মুখে যাহা বলিয়া দিলেন, কার্য্যেও তাহাই করিলেন। কৃষ্ণকান্তের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে, গোবিন্দলাল ভিন্ন রোহিণীর আর কোনই সহায় ছিল না।

ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের অনুরাগ সম্বন্ধে এখন বেশি কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। এখন ইহা এত পরিস্কার ও সুস্পষ্ট যে, লিখিয়া বুঝাইতে গেলে বরং তাহা জটিল হইয়া পড়িবে। তবে, একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। ভ্রমর কিছু কালো—গোবিন্দলাল সুপুরুষ। কিন্তু তবু তিনি ভ্রমরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এ প্রণয়ে রূপ-সম্ভোগ নাই—রূপজ মোহ নাই। এ প্রণয় গুণজ ও সংসর্গজ, সুতরাং স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও পবিত্র। রূপের সহিত যুক্ত থাকিলে, ইহাতেই আমরা প্রণয়ের সকল ভাব একত্রিত ও পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত দেখিতে পাইতাম। তাহা হইলেই ইহাতে চন্দ্র,

ঈর্ষ্যা উভয়েরই ছায়া থাকিত। তাহা ছিল না সত্য, কিন্তু গুণজ ও সংসর্গজ প্রণয় যতদূর উর্দ্ধে উঠিতে পারে, এ ক্ষেত্রে তাহাই উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ ইহাই হৃদয়ের স্থায়ি-ভাব ও কেবল ইহাকেই আমরা সচরাচর বিশুদ্ধ প্রণয় বলিয়া থাকি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ—যে দিন গোবিন্দলাল রোহিণীর মুখে শুনিতে পাইলেন যে, সে তৎপ্রতি সাতিশয় আসক্ত, সেই দিন হইতেই তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। রোহিণীর জল-নিমজ্জন পর্য্যন্ত এই অধ্যায় বিস্তৃত।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছি, রোহিণীর দুঃখ দেখিয়া গোবিন্দলালের তৎপ্রতি একটি স্থায়ী দয়া সঞ্জাত হইয়াছে। এ অধ্যায়েও সে দয়া প্রায় দয়াভাবেই রহিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বেশি হইয়া থাকিবারই সম্ভব। আমরা 'প্রায়' কথাটি বলিলাম এই জন্য যে, তৎসঙ্গে গোবিন্দলালের অজ্ঞাতসারে আরও একটি ভাবের আভাস পাই। গোবিন্দলাল পর-দুঃখ-কাতর, কিন্তু রোহিণীকে তিনি দেশত্যাগী করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহা যে শুদ্ধ রোহিণীর মঙ্গলের জন্য, তাহা বোধ হয় না। আর, যখন গোবিন্দলাল জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে, বৈকালে রোহিণীর কথা বলিতে যান, তখন তাঁহার একটু লজ্জা করিতে লাগিল। সেই দিন প্রাতেও তাঁহার এ লজ্জা ছিল না। সত্য বটে, রোহিণী যে তাঁহাকে তৎপ্রতি তাহার আসক্তির কথা বলিয়াছিল তাহাই ইহার কারণ। কিন্তু সে কারণের মধ্যে অতি ক্ষীণভাবে আরও একটি ভাব থাকিতে পারে।

গোবিন্দলালের সাধুচরিত্র প্রথম অধ্যায়ে আমরা যেরূপ ভাবে দেখিয়াছি, এ অধ্যায়ে তদপেক্ষা কিছু বিকসিত দেখিতে পাই। তিনি যে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সচ্চরিত্র হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সেই সচ্চরিত্রের বিকাশ আমরা পূর্ব্বে এত দেখিয়াছিলাম না। একটি ঘটনায় তাহা বড় সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রোহিণী যখন গোবিন্দলালকে মনের কথা বলিতে অগ্রসর হইল, "গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ,এ ভুজঙ্গও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইলনা—রাগও হইলনা। সমুদ্রবৎ সে হৃদয়,তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন, 'রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয়,

তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?'"

এইখানে আমরা গোবিন্দলালের চিত্ত-সংযম দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, প্রতাপকে মনে পড়িল। রূপে অতুলনীয়া, বালবিধবা, যুবতী, লালসাবতী রোহিণী আসিয়া ভ্রমরের স্বামীর নিকট তাহার মনের কথা জানাইল, কিন্তু তাহা শুনিয়া "তাঁহার আহ্লাদ হইলনা—রাগও হইলনা। সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।" কি সুন্দর! রোহিণীর সে কথা শুনিয়া গোবিন্দলালের আহ্লাদ হইলনা, রাগও হইলনা। শুধু আহ্লাদ হইলনা, ইহা শুনিলেই আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত ও আহ্লাদিত হই; যখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে পড়ি, রাগও হইলনা, তখন তাহার মাধুর্য্যে আমরা মোহিত হইয়া পড়ি। যে শ্রেণীস্থ লোকের একথা শুনিয়া আহ্লাদ হয়না, তাঁহাদের প্রায়ই 'রাগ' হয়। দুশ্চরিত্রার ঘৃণিত অভিলাষের কথা শুনিয়া ঘৃণা হয়। একটা বলবান্ প্রকৃতি দ্বারা অন্য একটা বলবান্ প্রকৃতির দমন বড় বেশি শক্ত নহে—ক্রোধ দ্বারা শোক, দুঃখ দমন করিতে, আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু অবিচলিত চিত্তে এরূপ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা শুনিতেও আশ্চর্য্য বোধ হয়। রোহিণীর এ কথায় কি হইল? না, সমুদ্রবৎ তাঁহার হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।* পূর্ব্ববৃত্তিই বজায় রহিল, তবে তাহার মাত্রা বাড়িল। ধন্য গোবিন্দলাল! এ স্থলে বুঝি তুমি প্রতাপকেও পরাজয় করিয়াছিলে! প্রতাপ ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে আত্মসংযমী, তোমার হৃদয় এইরূপই ছিল যে তাহা বিলোড়িতই হইল না। যদি তুমি শেষেও এই ভাবটি বজায় রাখিতে পারিতে—কিন্তু তাহা হইলে এ গ্রন্থ হইত না—তবে তোমাকে প্রতাপ হইতেও উচ্চে স্থান দিতাম।

---

* এই স্থানটি লইয়া বড় তর্ক উঠিয়াছিল। তর্ক দুইটি কথা লইয়া।(১) যে গোবিন্দলালকে আমরা রূপতৃষ্ণায় এত হাহাকার করিতে দেখিলাম, এখন যে সেই গোবিন্দলালে সে ভাবের অঙ্কুরমাত্রও দেখিতে পাই না, ইহা কিরূপে ব্যাখ্যাত হইবে? (২) গোবিন্দলালকে আজীবন সতর্ক দেখিলাম। যে এত সতর্ক, তাহার হৃদয়ে অবশ্যই কোন কুভাব রহিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাকে ধার্ম্মিক বলা সঙ্গত হয় কি?

দ্বিতীয় কথার উত্তর অতি সহজ। কাহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিলেই ঋষ্যশৃঙ্গ বলা হয় না। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাপ জন্মিবার কোন পদার্থ নাই, একথা আমরা বলিতে পারি না। প্রথমে সকলের হৃদয়েই

গোবিন্দলালের হৃদয় যে এত স্থির, তবুও তাহার সতর্কতাটুকু বিলক্ষণই রহিয়াছে। তিনি আত্মসংযমে সম্পূর্ণ ক্ষমবান্, তবুও প্রলোভনের সঙ্গে অনর্থক কাটাকাটি করিয়া বাহাদুরি দেখাইতে ইচ্ছুক নহেন। তাই, তিনি রোহিণীকে দেশত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলেন।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট রোহিণী-সম্বন্ধীয় যাবদীয় কথাই বলিলেন। পাঠকবর্গ ভ্রমর-গোবিন্দলালের এই সময়কার কথোপকথন একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া পড়িলে, দেখিতে পাইবেন যে, রোহিণীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। বড় ধীরে,—যেন অতিমৃদুপাদবিক্ষেপে চোর ঘরে প্রবেশ করিতেছে। গোবিন্দলালের চিত্রে কবির অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সকল বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছি না—কিন্তু স্থানে স্থানে এত বিস্মিত হইয়াছি যে, "কৃষ্ণকান্ত উইল"র এমন অনাদর (তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায়) কেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক, তবু ভ্রমরের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে বলিতে হইবে।

তাহা থাকে। গোবিন্দলাল তাহা সম্যক্ শমিত রাখিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলি। এ কথা আর একটু পরে আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি। এখন প্রথম কথাটি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, গোবিন্দলালের রাগও হইল না, আহ্লাদও হইল না, কেবল সমুদ্রবৎ সে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। এত রূপতৃষ্ণা যার, তার কি এইরূপ সম্ভবে? কথাটি অতি গুরু-তর—বাস্তবিক পক্ষে আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহাই আমা-দিগের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর। একথার উত্তর সহজে দিতে পারা যায় না। আমরা এইটুকু বুঝি যে, আমাদিগের হৃদয়ের যে ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, তাহা অতি অল্প সময়েই অবিমিশ্রিত থাকে। তবে এই মিশ্রণের মধ্যে যে ভাবটি অধিক পরিমাণে থাকে, তাহারই আকারে সবগুলি বাহির হইয়া পড়ে। গোবিন্দলালের এখন দয়ার ভাবটিই বেশি প্রবল হইল। তাঁহারই জন্ম রোহিণী এত অসুখী, আবার রোহিণীর এ অসুখ নিতান্ত অপ্রতি-বিধেয়, এই জন্য এ স্থলে তাঁহার দয়ার ভাবটিই প্রবল ছিল, তাহাই ফুটিয়া উঠিল। তবে আবার অক্ষুব্ধ-চিত্তে তিনি এ কথা শুনিলেন, বলি কেন? এতদুত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে, এ দয়াটা তাঁহার আজ নূতন হইল না। দয়া পূর্ব্বেই ছিল, এখন কিছু মাত্রা বাড়িল। এ স্থলে তাঁহার আহ্লাদ বা রাগ প্রকাশিত না হইয়া যখন পূর্ব্বসঞ্জাত দয়াই ফুটিয়া পড়িল, তখন তিনি ওরূপ প্রশংসার অনুপযুক্ত কি?

তৃতীয় অধ্যায় ঃ—গোবিন্দলাল যে দিন দেখিতে পাইলেন, রোহিণী আকাঙ্ক্ষার তীব্রদাহে জর্জ্জরিত হইয়া বারুণী-জলে নিমজ্জিতা হইল, যে দিন গোবিন্দলাল বহু চেষ্টা করিয়া হৈমপ্রতিমা রোহিণীর জড়বৎ দেহে চৈতন্য সঞ্চার করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। গোবিন্দলাল বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া যে দিন ভ্রমরকে দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়াও যখন ভ্রমর বাড়ী হইতে গেল, আর আসিল না, সেই দিন পর্য্যন্ত এই অধ্যায় বিস্তৃত।

এই অধ্যায়েই তাঁহার রোহিণী-প্রসক্তি, রূপ-তৃষ্ণা ফুটিয়া পড়িল, এইখানেই গোবিন্দলাল জানিতে পারিলেন যে, রোহিণীর জন্য তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে। রোহিণীর প্রতি পূর্ব্বে তাঁহার কিরূপ ভাব ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি—এখন কিরূপ ঘটনায় তাহা আসক্তি ও ভোগ-বাসনায় পরিণত হইল, তাহা আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

মনের উপর বাহ্যিক অবস্থার প্রভুত্ব অসাধারণ। এই জন্যই জ্ঞানী লোকেরা আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। এই জন্যই আমাদিগের নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে, যুবক ও যুবতী ঘৃতবহ্নিবৎ সম্পর্কান্বিত—ইহাদের একত্র সমাবেশ বা সংস্পর্শ অবস্থা বিশেষে বড়ই ভয়ানক হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পৃথিবীতে যত প্রকার শত্রু আছে, যুবকের পক্ষে কামরিপুর তুল্য বলবান কেহই নহে। গোবিন্দলাল ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, সতর্ক হইয়াও ইহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিলেননা—তাঁহার যে দোষে এ অধঃপতন ঘটে, তাহা আমরা পরে বলিব ; যে জন্য তাহার সূত্রপাত হয়, তাহা আমরা এখন দেখাইতেছি।

বাসনার তীব্র জ্বালা সহিতে না পারিয়া, রোহিণী আত্মহত্যা করাই সুপরামর্শ স্থির করিল। একদিন বৈকালবেলা, তখন গোবিন্দলাল বারুণীর তটে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, রোহিণী সুন্দরী কলসী কক্ষে করিয়া বারুণী পুকুরে জল আনিতে গেল—বুঝি প্রলোভন আর সহ্য হইলনা, কলসীটি ভাসাইয়া রোহিণী আত্মহত্যার্থ জলে নিমজ্জিতা হইল। কলসীটিকে ভাসিতে দেখিয়া এবং তথায় অন্য কোন পুরুষ ও স্ত্রীলোককে দেখিতে না পাইয়া গোবিন্দলালের মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল।

"গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্ব্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুল্য

স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।” গোবিন্দলাল জলে ডুব দিয়া রোহিণীকে সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী সংজ্ঞাহীন, নিশ্বাস প্রশ্বাস রহিত। গোবিন্দলাল একজন মালীর সাহায্যে রোহিণীকে উদ্যানগৃহে লইয়া গেলেন। “বাত্যাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্ববান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল দীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ-শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়-বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্দুলী পুষ্পের লজ্জাস্থল।”

“গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, - দিয়াছিলেনত সুখী করিলেন না কেন?” “এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—একথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।”

গ্রন্থকার এতদ্দ্বারা তখনকার রোহিণীতে যে সকল আকর্ষণী শক্তি ছিল, অতি সুন্দর করিয়া দেখাইয়া দিলেন। গ্রন্থের এ ভাগ কাব্যাংশে বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এই স্থানটা এইরূপ ভাবে চিত্রিত না হইলে, গোবিন্দলালের প্রতি কিছু অন্যায় করা হইত। গোবিন্দলাল সাধু সচ্চরিত্র, আত্মসংযমী—গোবিন্দলাল আজ যে রূপ দেখিয়া বিচলিত, তাহার মহিমা কে লঙ্ঘন করিতে পারে? সে প্রকৃতির শাসন কে অতিক্রম করিতে পারে? এইটিও ঈশ্বরেরই নিয়ম—পাপে যদি আকর্ষণ না থাকিত, পাপের দিকে আকর্ষিত হইতে যদি মানবের একটা স্বাভাবিকী ইচ্ছা না থাকিত, তবে পুণ্য কাহাকে বলিতাম? আত্মসংযম কাহাকে বলিতাম? ইন্দ্রিয়জয় কাহাকে বলিতাম? পাপে আকর্ষিত হইতে আমাদিগের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই রহিয়াছে, কিন্তু সেই প্রকৃতি দমন করিতেও আমাদিগের ক্ষমতা রহিয়াছে। এই ক্ষমতাটি স্বাভাবিক হইলেও, তৎবিকাশে মনুষ্যের প্রভূত যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। পাপেচ্ছাটা এই ক্ষমতা দ্বারা যখন আমরা

বিনাশ করিতে পারি, তখন আমরা জিতেন্দ্রিয় হই; যখন দমনে রাখি, তখন আত্মসংযমী হই। সেই ক্ষমতটা বিকাশ সাপেক্ষ, তাই আত্মসংযমে এত পুণ্য—তাই জিতেন্দ্রিয় পুরুষের স্বর্গ নিশ্চিত। সহজে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহার মূল্য কোথায় দেখিয়াছ? এতটা ভাবিয়া গ্রন্থকার এখানে তখনকার গোবিন্দলালের চক্ষে রোহিণীকে দেখিয়া লইলেন, পাঠকবর্গকেও দেখিতে বলিলেন। তাঁহার অসীম স্নেহের পাত্র গোবিন্দলাল আজ কিরূপ ঘটনার সন্তাড়নে এত বিচলিত, ধর্ম্মপথস্খলনেচ্ছু, তাহা তোমাদিগকে না দেখাইলে কি তাঁহার স্নেহের কার্য্য হইত?

সহৃদয় গোবিন্দলাল সে রূপ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 'এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল, একথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।' দয়ার ভাব আর একটু উচ্চে উঠিয়া সহানুভূতিতে পরিণত হইল—আসক্তিতে জমাট বাঁধিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থার সম্মিলন যদি এরূপভাবে বর্ণিত না হইত, তাহা হইলে গোবিন্দলালের পূর্ব্বদৃষ্ট সচ্চরিত্র ফাঁকা বলিয়া বোধ হইত। গোবিন্দলালের চিত্তবল অসামান্য—আবার অবস্থার সম্মিলনে পাপপথে আকর্ষণ-শক্তিও অসাধারণ। ইহা যে তাঁহার জয় করা উচিত ছিল না, একথা অবশ্য কেহই বলিতে পারে না। ফলতঃ তিনি তাঁহার জীবনের এ অধ্যায়ে তাহা দমনও করিয়াছিলেন,—কিন্তু সে শক্তিটিও যে সাধারণ নহে, তাহাই বলিলাম।

একটি সুন্দরী, পতিহীনা, তৎপ্রতিলালসাবতী, তাঁহারই জন্য জলনিমগ্না, যুবতীকে ঐরূপ অসংবৃত অবস্থায় সন্দর্শন, গোবিন্দলালকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। তাহাতে আবার দৌহিক সংস্পর্শ! "তাঁহার সেই পক্কবিম্ব বিনিন্দিত এখনও সুধাপরিপূর্ণ অধরে ফুৎকার"? কি সর্ব্বনাশ! পরম জ্ঞানী প্রাচীন ঋষিগণ ইহার বল জানিতেন বলিয়া পরপুরুষ-সংস্পর্শ পরম সতীরও সতীত্ব-ধর্ম্ম-ব্যাঘাতক বলিয়া গিয়াছেন। তোমরা হয়ত শুনিলে রাগ করিবে, আমরা কিন্তু বলিব এই কার্য্যটিতে গোবিন্দলালের চরিত্রটি বড় খুলিয়াছে। গোবিন্দলাল সাধ করিয়া সে কার্য্য করিতে যান নাই—একদিকে রোহিণীর মৃত্যু, অন্যদিকে তাঁহার বিচলিত হইবার সম্ভাবনা, দুই ওজন করিয়াই তিনি সেই "ফুল্লরক্ত কুসুম কান্তি অধর যুগলে ফুল্লরক্ত কুসুম কান্তি অধর যুগল স্থাপিত করিয়া" রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন। সেই সময়ে ভ্রমর একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল, লাঠি বিড়ালকে না

লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল—আকাশ হইতে দৈববাণী হইল যে গোবিন্দলালের অধঃপতন এই হইতেই আরম্ভ হইল। এমনি করিয়া না দেখাইলে কি অমন সাধু গোবিন্দলালের অধঃপতন দেখান যায়?

রোহিণী বাঁচিয়া উঠিলে, গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি কিছু বাসনা-পরবশ হইলেন। এই জন্য তাঁহাকে আমরা নিন্দা করিতে পারি না—কারণ এখনও তিনি আত্মসংযমে সম্পূর্ণ সচেষ্ট। তাঁহার চিত্ত-মধ্যে সুমতি-কুমতিতে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল—গোবিন্দলালের চিত্ত-ভূমি তাহাদিগের উভয়েরই অস্ত্রাঘাতে দারুণ নিপীড়িত হইতে লাগিল। গোবিন্দলাল ইচ্ছা করিয়া পাপ-স্রোতে গা ঢালিয়া দেন নাই—যখন সে স্রোত তাঁহাকে ভাসাইয়া লইতে চেষ্টা করিল, তিনি তৎবিরুদ্ধে বল প্রকাশ করিলেন। তখন দীন—পরম দীন গোবিন্দলাল "সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া, দর বিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন 'হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।'" অনাদিনাথ, দুর্ব্বলের সহায়, ভগবান্ সে কথা শুনিলেন, তাই গোবিন্দলাল তাঁহার জীবনের এ অধ্যায়ে বিপক্ষকে এত দমনে রাখিতে পারিয়াছিলেন। ভগবান্ এইরূপ কাতর স্বর শুনেন বলিয়াইত পাপাচরণে এত পাপ। রক্ষার এই উপায় আছে বলিয়াইত পতনে এত নিন্দা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দলালের ধারণা ও চেষ্টা উভয়ই ছিল। তাঁহার আত্মজয় করিবার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেষ্টার দিকেও চক্ষু পড়িল। গোবিন্দলাল বিষয়-কার্য্য দেখিবার জন্য বিদেশে—রোহিণী হইতে, সে স্মৃতিরুদ্দীপক পাপ স্থান হইতে দূরে, যাইতে মনস্থ করিলেন। মরুভূমে থাকিয়া কোন্ তৃষিত পথিক তাহার স্বচ্ছ সুবাসিত শীতল জল পানেচ্ছু না হইয়া পারে? ভ্রমর সঙ্গে যাইতে চাহিল—আবার অবস্থার সংঘটনে ভ্রমরের যাওয়া হইল না—তাহার শাশুড়ী তাহাকে যাইতে দিল না।* যদি তাহা হইত, তবে বুঝি এতটা ঘটিয়া উঠিত না। যাহা হউক

---

*গোবিন্দলালের অধঃপতনে আমরা বাহ্যিক অবস্থার বড়ই প্রাবল্য

গোবিন্দলাল এই পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইলেন যে, রোহিণীর কথা তাহার স্মৃতি মাত্র রহিল—তৎপ্রতি বাসনা তিনি উচ্ছেদ করিতে না পারিলেও, দমন করিতে পারিলেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা ভ্রমর ও গোবিন্দলাল সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছি, সমস্তই প্রায় পরিস্কার ও অকপট। কিন্তু এখন হইতেই কিছু বেশি গোল আরম্ভ হইল। আমরা যেমন প্রথমে দেখিয়াছি রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের বাসনা ধীরে ধীরে সঞ্জাত হইয়া, প্রথমে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া পরিশেষে সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িল, এখন হইতে আবার আমরা তেমনই দেখিতে পাইব, ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের ভালবাসাখানি, ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া একখানি কালো মেঘ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে। যাহা পূর্ব্বে পরিস্কার ও অকপট ছিল, তাহা জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া আসিবে।

যে দিন রোহিণীকে লইয়া বারুণী-তটের উদ্যান-গৃহে এতটা ব্যাপার হইয়া গেল, সে দিন গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন ?"

কিন্তু আজ যেন গোবিন্দলাল সে প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু অনিচ্ছুক। তিনি সে প্রসঙ্গই একেবারে উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। শেষে ভ্রমর যখন কাঁদিয়া কাটিয়া বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, গোবিন্দলাল বলিলেন।

'তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।'

'দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিওনা ভ্রমর'।

এ কিহে গোবিন্দলাল—আজ ভ্রমরের প্রতি তোমার এ অবিশ্বাস কেন ? বুঝিয়াছি, রোহিণীর প্রতি তোমার এ পাপ বাসনা যে পর্য্যন্ত বিদূরিত করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি ভ্রমরকে তাহা জানাইতে ইচ্ছা করিতেছনা ; বুঝিতেছি হয়ত তুমি ভাবিতেছ ভ্রমর তোমার মনের সব কথাগুলি বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না, আত্মসংযমের চেষ্টা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না, মাত্র তোমার পাপ বাসনাটাই বুঝিবে। হয়ত তুমি ভাবিতেছ, সে কথা শুনিয়া ভ্রমর তোমাকে অবিশ্বাস করিবে, অমন উজ্জ্বল হৃদয়ে

দেখিতে পাই। গোবিন্দলালের পাপ সূক্ষ্ম করা, অত বড় সাধু চরিত্রের একটা সুযৌক্তিক অধঃপতনের কারণ দেখানই ইহার উদ্দেশ্য।

কালিমা পড়িবে। বুঝিয়াছি, অন্যকে বিশ্বাস করিতে নিজের প্রতি বিশ্বাস চাই। কিন্তু যাহাই হউক, তুমি আজ এ কার্য্যটি ভাল করিলে না। রোহিণী যে তোমার প্রতি অনুরক্ত, তাহাত ভ্রমরকে বলিয়াছ, আজ যদি এ কথা চাপা দিয়া রাখ, একটু সাধারণ কথাতেই ভ্রমরের মন তুষ্ট হইতে পারে। রোহিণী-বাসনায় এই তোমার প্রথম বুদ্ধি বিগড়াইল।

গোবিন্দলাল বন্দরখালী যাত্রা করিলেন। ভ্রমর ধরিল সেও যাইবে। ভ্রমরের শ্বাশুড়ী তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না—হায়! তবে আর কে সেই মেঘ সরাইয়া গোবিন্দলালের চক্ষু ফুটাইবে? গোবিন্দলালও বুঝি তখন ভ্রমর হইতে কিছু দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন,—যে পর্য্যন্ত রোহিণীকে না ভুলিতে পারেন, সে পর্য্যন্ত ভ্রমরের নিকট মুখ দেখাইতে যেন একটু লজ্জা বোধ করিলেন। গোবিন্দলালের একান্ত ইচ্ছা জানিতে পারিলে তাঁহার মাতা কি ভ্রমরকে যাইতে দিতে অস্বীকার করিতেন?*

গোবিন্দলাল ভ্রমরকে এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলে, অল্পদিনের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল। ভ্রমর রোহিণীর নিকট শুনিতে পাইলেন, গোবিন্দলাল তাহার প্রতি আসক্ত। অনেক কারণে ভ্রমরের কিছু কিছু সন্দেহ হইতেছিল—তাহা আমরা ভ্রমরচরিত্র ব্যাখ্যার সময় সবিস্তার দেখাইব—এখন সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল, ভ্রমর রাগের মাথায় গোবিন্দলালকে লিখিয়া পাঠাইল,

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুইবৎসরের পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

"তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু

---

*এটুকু বড় চমৎকার কৌশল হইয়াছে। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে সঙ্গে নিতে অস্বীকার করিলে, তাঁহার চরিত্রে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে—ভ্রমর না যাইতে চাহিলে তাহার হৃদয়খানিতে কলঙ্ক আরোপিত হয়। ভ্রমর গেলেও গ্রন্থ চলিতে পারে না—তাই ভ্রমরের শ্বাশুড়ী আসিয়া বাধা দিল। সব দিক বজায় রহিল!

এখন বুঝিলাম, যে তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই—বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও, আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয় যাইব।"

পত্রখানি পড়িয়া আমাদিগেরই বিশ্বাস হয় না যে, এখানি ভ্রমরের লেখা। আমরা কিন্তু ভ্রমরের এ প্রকার পত্রলেখার কারণগুলি সবই জানি, সবই বুঝিতেছি। দরিদ্র গোবিন্দলাল ইহা পড়িয়া যে কিরূপ বিস্মিত হইতে পারেন, তাহা কি আবার ব্যাখ্যার আবশ্যক? বাস্তবিকই "তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল।" এই পত্র ভ্রমরের লেখা! গোবিন্দলাল এ পর্য্যন্ত ভ্রমরের মনের সন্দেহও জানেন না, বিশ্বাসও জানেন না। তাঁহার নিকট এটি যেন বিনা মেঘে হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতন বোধ হইল।

গোবিন্দলাল আরও একখানি পত্র পাইলেন—তাহাতে সংবাদ অন্যরূপ। ভ্রমর রটাইয়াছে যে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছেন। "গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন।—ভ্রমর রটাইয়াছে?" মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, গোবিন্দলাল পরদিন নৌকারোহণে "বিষণ্ন মনে," গৃহে যাত্রা করিলেন।

গোবিন্দলালের এখনকার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। তিনি যে ভ্রমরের নিকট অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্ন হইবেন না বলিয়া (এই কথাটির মধ্যে একটু গূঢ় রহস্য আছে, তাহা আমরা স্থানান্তরে দেখাইব) আত্মসংযমের চেষ্টায় এত রক্তারক্তি করিতেছিলেন, সেই ভ্রমর নির্দ্দয় হইয়া তাঁহাকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছে? সেই তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্রের কলঙ্ক রটনা করিয়াছে? কথাটি গোবিন্দলালের অন্তরতম প্রদেশে বিদ্ধ হইল—গোবিন্দলাল ভ্রমর সম্বন্ধে এই প্রথম যাতনা অনুভব করিলেন। ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের প্রসক্তি যে কিরূপ গাঢ় ও স্থায়িভাবাপন্ন ছিল, তাহা আমরা এখন কিছু সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। গোবিন্দলাল পত্র পাইয়াই ভ্রমরের উপর রাগ করিয়া উঠিলেন না, ভ্রমর কর্ত্তৃক তাঁহার কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছে, বিশ্বাস করিয়া বসিলেন না, তিনি মাত্র "বিস্মিত ও বিষণ্ন" হইলেন!

চতুর্থ অধ্যায়ঃ—গোবিন্দলালের গৃহে প্রত্যাগমন দিবস হইতে, তাঁহার অধঃপতনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই অধ্যায় বিস্তৃত।

গোবিন্দলাল বাটী আসিয়া ভ্রমরকে না দেখিতে পাইয়া সকলই বুঝিতে পারিলেন। "মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন 'এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?'" রাগ করিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। মনে করিলেন, ভ্রমরেকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দলাল রোহিণী সম্বন্ধীয় পাপেচ্ছা দমন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে আমাদিগের গ্রন্থকারের কথা কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলেই কথাটি বেশ পরিস্কার হইবে।

"শেষ দুর্ব্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহা স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। উপন্যাসে শুনা যায়, কোন কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম হইয়াছে, ভূত দিবারাত্র উকি ঝুকি মারে, কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উকি ঝুকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চন্দ্রসূর্য্যের ছায়া আছে, চন্দ্র সূর্য্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্ররোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।"

"তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগর-তরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্রা। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চল ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল।"

এ পর্য্যন্ত গোবিন্দলাল আত্মসংযমে সচেষ্ট ছিলেন, মনে মনে স্থির করি-

ছিলেন "মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্ন হইব না।" কিন্তু এখন আর ভ্রমরের জন্য তত ভাবনা নাই—কাজেই গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি আসক্তির সংযম আবশ্যক বোধ করিলেন না। এই স্থলে আমরা দেখিতে পাইলাম, গুণজ প্রণয় হইতেও একটি উচ্চতর প্রণয় আছে, সেটি কর্ত্তব্যজ। গুণ নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ কর্ত্তব্য চিরস্থায়ী। গোবিন্দলাল যদি ভ্রমরের গুণে ভ্রমরকে ভাল না বাসিয়া, ভ্রমরকে ভালবাসা তাঁহার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ভাবিয়া ভাল বাসিতেন, তবে এরূপ কাণ্ড ঘটিতে পারিত না। এ কথাটি আরও একটু খুলিয়া অন্যত্র দেখান যাইবে।

গোবিন্দলালের যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমস্তই তাঁহার সচ্চরিত্রতার পরিজ্ঞাপক। কিন্তু সেই সচ্চরিত্রের মধ্যে, ধর্ম্মানুরাগের মধ্যে, একটি ভয়ানক ভ্রম ছিল। সে ভ্রমটি গ্রন্থকারের নিজের কথায় আমরা নিম্নে বুঝাইয়া দিতেছি।

"তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য নহে; ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোন কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।"*

বঙ্গদর্শন—ভাদ্র ১২৮৪। কৃষ্ণকান্তের উইল ২৪ পরিচ্ছেদ, ২১৬ পৃঃ।

---

* দ্বিতীয় সংস্করণে এই স্থানটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা উঠাইয়া দিবার অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে, ইহা যদিও এরূপ স্পষ্টভাবে দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থ মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না, গোবিন্দলালের হৃদয় হইতে ইহা উঠাইয়া লওয়া হয় নাই। যে পর্য্যন্ত তাহা না দেখিব, সে পর্য্যন্ত আমরা ইহাই স্থির করিব যে, এই নীতিটি গোবিন্দলালের চরিত্র-মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই গ্রন্থকার এইরূপ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে যে রহস্যের কথা বলিয়াছি, তাহা এই। 'মরিতে হয় মরিব, কিন্তু ভ্রমরের নিকট অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্ন হইব না।' এই কথাতেই এ তত্ত্বটি প্রকাশিত নাই কি? গোবিন্দলাল ইহা বলিতেছেন না যে 'মরিতে হয় মরিব, তবু পাপপথে পদার্পণ করিব না।' ইহাতে গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছু অসামঞ্জস্য ঘটে, এরূপ

আমরা পূর্ব্বে একস্থলে বলিয়াছি যে, আমাদিগের কোনও প্রকৃতি দমন করিতে হইলে, আমরা তদধিক প্রবল কোন প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি। গোবিন্দলালের ভ্রমরাসক্তি অত্যন্তই প্রবল ছিল, কিন্তু এখন ভ্রমরা-চরণে ক্রোধ অভিমান আসিয়া ইহাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিল। সহজে পারে নাই সত্য, রাগ করিতে করিতেও তিনি ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার কাঁদিতে লাগিলেন। "ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, একথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি ? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।" দেখিলে, গোবিন্দলালের মনে এখন একবার দুঃখ বা ভ্রমর-স্মৃতি, একবার রাগ কিরূপে পর্য্যায়ক্রমে জয়লাভ করিতে ছিল? গোবিন্দলাল সহজে ভ্রমরের উপর রাগ করিয়া তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই।

যখন দুঃখ ও অভিমান এই প্রকার পরস্পরকে পর্য্যুদস্ত করিতে বিরোধ করিতেছিল, তখন আর একটি প্রবল বল আসিয়া অভিমানের পক্ষে যোগ দান করিল। ভ্রমরের কঠোর ব্যবহারের সহিত রোহিণীর রূপপ্রভা ও আসক্তি যোগ দান করিয়া তৎপ্রতি তাঁহার আসক্তিকে পরাজয় করিল। কিছুকালের জন্য একখানি মেঘ আসিয়া গোবিন্দলালের ভ্রমরাসক্তি আচ্ছাদন করিয়া বসিল। দুই একবার তাহা বাতাসে এদিক ওদিক সরিয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। এ মেঘ যে পর্য্যন্ত সম্যক্ না কাটিল, এ চন্দ্র আর প্রভাসিত হইল না।

আমরা স্বীকার করি না। গোবিন্দলালের এ ভ্রম উচ্চশিক্ষারই একরকম কুফল বটে। অশিক্ষিতের এরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে না। এরূপ ভ্রম সত্ত্বেও গোবিন্দলাল পূর্ব্ববৎ আত্মসংযমী, ধার্ম্মিক ও সহৃদয় থাকিতে পারেন। গোবিন্দলালের এ ভ্রমের কার্য্য পূর্ব্বে ঘটিয়া উঠে নাই—তাই তাহা থাকিয়াও তাঁহার বড় একটা ক্ষতি করিতে পারে নাই। আর, এখন তাঁহার এই-রূপ ভ্রম নূতন জন্মিতেও পারে—তাহাতেও কোন অস্বাভাবিকতা ঘটে না। আমরা উভয় প্রকারের লোকই দেখিয়াছি। তবে, অস্বাভাবিক বা অসংলগ্ন হইবে এই ভাবিয়া গ্রন্থকার এই কথাটি তুলিয়া লইয়াছেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আর, এ তত্ত্বটি আমাদিগের এত ভাল লাগিয়াছে, ও এখনকার দিনে, ইহা এত উপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে যে, আমরা এখানে ইহা তুলিয়া না দিয়াই পারিলাম না। গ্রন্থ-কারের নিকট এজন্য আমরা সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করি।

গোবিন্দলালের মাতা এখন পুত্রবধূর সংসারে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া কাশী যাইতে ইচ্ছা করিলেন। গোবিন্দলাল তখনি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি স্বয়ংই তাঁহাকে কাশী রাখিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। ভ্রমর তখন পিত্রালয় ছিল। ভ্রমর আসিয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।" গোবিন্দলাল বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।" ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল "কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি?"

"গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্র। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না?

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্র। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।"—ইহা বলিয়া ভ্রমর একখানি দানপত্র তাঁহার হস্তে দিল। গোবিন্দলাল তাহা পড়িয়া বলিলেন,

"তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল, বহু মূল্য দান-পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভ্রমর বলিল, "পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারিতে ইহার নকল আছে।"

"গো। থাকে থাক। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমায় স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী, আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।"

গোবিন্দলালের ইচ্ছা কার্য্যে প্রায়ই পরিণত করিতেন, তাই পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছি। পূর্ব্বে তিনি সাধু ছিলেন, মনে সদেচ্ছাই উদিত হইত। এখন হইতে ইহাই তাঁহার একটি ভয়ানক দোষে পরিণত হইল, ঔদ্ধত্যে পরিগণিত হইল। এই ঔদ্ধত্যই তাঁহাকে রোহিণীকে হত্যা করিতে আজ্ঞা প্রদান করে। অন্তরটি ভাল থাকিলে যাহা গুণের থাকে, ইচ্ছা দূষিত হইলে, তাহা ভয়ানক দোষে পরিণত হয়। চোরের বুদ্ধিও এইরূপ।

গোবিন্দলাল এইরূপে ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আসিলেন। "বালিকার, অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিন রাত্রি ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন যাহা করিয়াছি তাহা আর এখন ফিরে না—এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাহাহউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই।" ভাবিলেন, "এত তাড়াতাড়ী কি? যখন মনে করিব তখনই ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া—বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, কষাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয় মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।"

গ্রন্থকারের নিজভাষায় আমরা এ অধ্যায়ের ভ্রমর-গোবিন্দলাল সম্বন্ধীয় ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়া লইলাম—এখন দুই এক কথা বলিব। অধিক বলিবার প্রয়োজন গ্রন্থকার রাখেন নাই।

আমরা দেখিতে পাইয়াছি, ভ্রমরের উপর গোবিন্দলালের এখন এক রকম আশ্চর্য্য ক্রোধ জন্মিয়াছে। ভ্রমরের কোন কথাই যেন তাঁহার সহ্য হয় না—যে সব কথা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়, সহৃদয় গোবিন্দলাল আজ সে সব কথায় বিচলিত হইলেন না—কারণ ভ্রমরের

একদিনকার অপরাধ রোহিণীর রূপরাশির সহিত যুক্ত হইয়া, অথবা রোহিণীর রূপরাশি ও তৎপ্রতি তাঁহার দুর্দ্দমনীয় বাসনা, একদিনের ভ্রমরের অপরাধরূপ দুর্ব্বল সময়ে গোবিন্দলালের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, ভ্রমরের গুণরাশির মোহকে অভিভব করিয়া ফেলিল। তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের কথায় কথায় রাগ করিতেন—ক্ষমা চাহিলেও ক্ষমা করিতেন না—তাহা হইলে বাসনার পরিতৃপ্তি হয় কই? আসল কথা, গোবিন্দলালের মন এখন কেবল ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিল—ছিদ্র পাইয়া সুমতি, কুমতি দুইই, একই রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাকে এইরূপ কার্য্যে ব্রতী করিল। ভ্রমরের গুণের কথা দুই একবার মনে পড়িত বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। রোহিণীর রূপরাশিই মনে বেশি জাগিত।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ—রোহিণীর প্রতি আসক্তির প্রশ্রয় ও পরিণতির পর হইতে,—আবার বারুণী-ঘাটে রোহিণীর সহিত সন্দর্শনের দিবস হইতে, গোবিন্দলালের ভ্রমর-পরিত্যাগ পর্য্যন্ত এই অধ্যায় বিস্তৃত।

এই অধ্যায়ে রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের সম্বন্ধ পরিস্কার—তৎসম্বন্ধে বেশি কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

এবারে ভ্রমরের সহিত তাঁহার ব্যবহার ও আসক্তিই আমাদিগকে দেখাইতে হইবে।

অনেকবার দেখাইয়াছি যে, বাহ্যিক কতকগুলি অবস্থা গোবিন্দলালের সহিত বড় শক্রতা করিয়া আসিতেছিল। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুও তন্মধ্যে একটি। বুড়া যদি এ সময়টা বাঁচিয়া থাকিত, আমরা তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ভরসা করিতে পারা যাইত যে এ বিবাদে গোবিন্দলালের একটা পথ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্য গোবিন্দলালের অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অসময়ে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হইল।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিল—আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল। গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে যে বড় একটা হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। "গোবিন্দলাল একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন,

'ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। * * * শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে

তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।' ভ্রমরও ইহা স্বীকার করিল। এইখানে গ্রন্থকার তাঁহার ভ্রমর-গোবিন্দলালের পূর্ব্ব প্রণয় ও এখনকার অবস্থা অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন; আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি।

"আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল—দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না, যে আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুন লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুন লাগিয়াছে ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসে না? গোবিন্দলাল কি হাসে না? হাসে, কিন্তু সে হাসি আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অর্দ্ধেক বলে, সংসার সুখময়, অর্দ্ধেক বলে, সুখের আকাঙ্ক্ষা পুরিল না—সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই—যে চাহনি দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত 'এত রূপ!'—যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত, 'এত গুণ!'—সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে স্নেহপূর্ণ স্থির-দৃষ্টি প্রমত্ত গোবিন্দলালের চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবনে আমি সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,—যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, ইহসংসার সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয় সম্বোধন আর নাই—সে 'ভ্রমর', 'ভোমরা', 'ভোমর', 'ভোম্', 'ভুমরি', 'ভুমি', 'ভুম্'—সে সব নিত্য নূতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখ পূর্ণ সম্বোধন আর নাই। সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলেসোণা, কালোমাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে—সে প্রিয় সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, ওলো,—সে প্রিয় সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না—এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা, অর্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে, প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রে

থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয়, 'বড় গরমি,' নয়, 'কে ডাকিতেছে' বলিয়া একজন উঠিয়া যায়। সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাটি সোণায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুর বাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।"

অতি সুন্দর চিত্র আমরা দেখিলাম। বাস্তবিকই সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছিল, কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছিল!

ইহার পরে ভ্রমরের সহিত গোবিন্দলালের উইল সম্বন্ধে কিছু তর্ক উঠিল। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে সৎপথে আনিতে মৃত্যুকালিন উইলে ভ্রমরকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিয়াছেন—গোবিন্দলাল তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। এখন ভ্রমর ও তিনি ঠিক এক নহেন—ভ্রমরের বিষয় তাঁহার বিষয় নহে। ভ্রমর গোবিন্দলালকে তৎসমস্ত লিখিয়া দিতে চাহিল; গোবিন্দলাল স্বীকার করিলেন না—ভ্রমরের দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন? ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন, "গোবিন্দলাল কথা কহিলেন না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতছিলেন 'এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব। আমার এ অসার আশা-শূন্য, প্রয়োজন-শূন্য জীবন যথেচ্ছা কাটাইব। মাটীর ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেইদিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।'"

এই গোবিন্দলালকে আমরা একদিন বলিতে শুনিয়াছি,

"সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?" "পাপে কাহারও অধিকার নাই, আত্ম-হত্যা মহাপাপ।"

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল "কি বল?" গোবিন্দলাল বলিলেন,

"আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

সে দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল,—শেষে গোবিন্দলাল ভাবিতে লাগি-লেন, কি অপরাধে তিনি ভ্রমরকে ত্যাগ করিতেছেন। গ্রন্থকার তখন তাঁহার সুমতি ও কুমতিতে এইরূপ কথোপকথন ঘটাইলেন।

কুমতি বলিল "ভ্রমরের প্রথম এইটি অপরাধ, এই অবিশ্বাস।" সুমতি উত্তর করিল, "যে অবিশ্বাসের যোগ্য—তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন?

তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেইটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই কি তার এত দোষ?” কুমতি। “এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন আমি নির্দ্দোষী।” সুমতি। “দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না—দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ?” কুমতি। “ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। সাধুকে চোর বলিলে বলিতে চোর হয়।” সুমতি। “দোষটা যে চোর বলে তার, যে চুরি করে তার কিছু নয়।” কুমতি। “তোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পার্‌ব না। দেখ্‌না ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল? আমি বিদেশ থেকে আস্‌ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল?” সুমতি। “যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে?” কুমতি। “সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি?” সুমতি। “এ কথা কি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ?” কুমতি। “না।” সুমতি। “তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর, নিতান্ত বালিকা, না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গাম? সে সব কাজের কথা নহে—আসল রাগের কারণ কি বলিব?” কুমতি। “কি বলনা?” সুমতি। “আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না।” কুমতি। “এতকাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?” সুমতি। “এত কাল রোহিণী জোটে নাই। একদিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছ বলিয়া, কাল দুর্দ্দিন হইবে না কেন?* শুধু কি তাই—আরও আছে।” কুমতি। “কি?” সুমতি। “কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে—বিষয় তোমারই রহিল। জানিত যে ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্র শোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া

---

*গোবিন্দলালের এই মনের কথাটি কি সম্পূর্ণ সত্য? ‘এতকাল’ কথাটির পরে ‘একরূপভাবে’ কথাটিত পড়িয়া যায় নাই?

উঠিয়াছ।” কুমতি। “তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহারা খাইব নাকি?” সুমতি। “তোমার বিষয় তুমি ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?” কুমতি। “স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?” সুমতি। “আরে বাপ্‌রে! কি পুরুষ সিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকর্দ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লওনা—তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।” কুমতি। “স্ত্রীর সঙ্গে মোকর্দ্দমা করিব?” সুমতি। “তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।” কুমতি। “সেই চেষ্টায় আছি।” সুমতি। “রোহিণী—সঙ্গে যাবে কি?”।

আমরা ইহা পড়িয়া বুঝিলাম—গোবিন্দলালের বুদ্ধির ত্রুটি কিছুই নাই। তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা না বুঝিয়া নহে। ভ্রমর যে অপরাধিনী নহে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেছেন, কিন্তু রোহিণী তাঁহার নিকট অপরিত্যজ্যা।

গোবিন্দলালের সুমতি কুমতির বিবাদে আমরা অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সেই ক্ষীণ আভা দেখিতে পাই। এখনও গোবিন্দলাল বিচার করিতেছেন—জীবনের সমালোচনা করিতেছেন। এখনও ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া গিয়া বিবাদ মিটাইতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু তাহা পারিতেছেন না। কেন পারিতেছেন না? উত্তর অতি সহজ। “ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইলনা।” এইরূপই ঘটিয়া থাকে বটে—এই সময়ে যেন আমাদিগের বড় লজ্জা ও আত্মসম্মান জ্ঞান উপস্থিত হয়। এক জনের নিকট একটা অপরাধ করিয়াছি, মনে মনে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু কার্য্যতঃ পারিয়া উঠিতেছিনা—আবার তাঁহার কাছে যাইব? ছি! বড় লজ্জা করে। আজ যাক্, আর একদিন হইবে। গোবিন্দলালের দশাও তাহাই হইল—“আর একদিন হইবে” ভাবিয়া তিনিও সেদিন স্থির রহিলেন। অথবা তাহা স্থিরও হইলনা। “একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া—বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, কষাঘাত করিলেন! পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয় মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।” কথাটি পড়িয়া গ্রন্থকারের আর একদিনকার কথা মনে পড়িল। তিনি একস্থলে লিখিতেছেন,

“হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এদিকে সংক্রামক জ্বর প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপ-

স্থিত! তখন, কাংস্য পাত্র বা কদলী পত্রে সুশোভিত, লুচি সন্দেশ, মিহি-দানা, সীতাভোগ, প্রভৃতির অমল ধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে, না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না— এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া—অন্যমনে—পর দ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।"

গোবিন্দলালও ঠিক তাহাই করিলেন। **চিন্তা বর্জ্জন পূর্ব্বক অশ্বে কষাঘাত করিলেন।** বঙ্কিম বাবু এইখানে একটি অশ্ব উপস্থিত করিয়া বড়ই ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন! এই তাঁহার একটি প্রধান গুণ যে, একটি ঘটনাও তাঁহার পুস্তকে অকারণ দেখিতে পাই না। এমন সাবধানে নবেল লিখিতে আমরা আর কাহাকেও দেখি নাই।

গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই চিন্তাশূন্য হইয়াছিলেন—এখন "পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয় মধ্যে ফুটিয়া পড়িল।" রোহিণীর রূপ-রাশি যদি কালো হইত,—আর কালো নয়ই বা কি করিয়া বলি?—লিখি-তাম, এ মেঘে ভ্রমরকে আচ্ছাদন করিয়া বসিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ—প্রসাদপুরের বিলাস-গৃহে বসিয়া যে দিন গোবিন্দ-লাল নিশাকর দাসের নিকট ভ্রমরের কথা শুনিতে পাইলেন, সেই দিন এ অধ্যায় শেষ হইল।

এ অধ্যায়ে মাত্র রোহিণীর উপভোগ দেখিতে পাই। তাহাতে ব্যাখ্যা করার কিছুই নাই। এ অধ্যায়ে গোবিন্দলাল ভ্রমরের কথা ইচ্ছা করিয়া ভাবিতেন না। ধর্ম্মের কথা মাথামুণ্ড আর কি বলিব?

সপ্তম অধ্যায়ঃ—রোহিণীর উপভোগে পরিতৃপ্তি ও ভ্রমরের গুণের স্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, রোহিণীর মৃত্যু পর্য্যন্ত এই অধ্যায় ভুক্ত।

গোবিন্দলাল এখন রোহিণীকে উপভোগ করিয়াছেন—তাঁহার রূপতৃষ্ণা তৃপ্ত হইয়াছে। আজ অনেক দিন পরে নিশাকর দাস তাঁহাকে ভ্রমরের কথা বলিল। (এই নিশাকর যখন প্রথম প্রসাদপুরের সে বিলাস-গৃহে উপ-স্থিত হয়, "অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল। গোবিন্দ-লালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল।" গোবিন্দলালের অধঃপতনের দিনে

বিড়াল মারিতে গিয়া লাঠি ভ্রমরের গায়ে লাগিয়াছিল, আজ গোবিন্দলালের উত্থানের দিনেও আবার সেইরূপই একটা হইল। বাস্তবিকই এই দুই দিন গোবিন্দলালের জীবনের অতি প্রধান দিন।) গোবিন্দলাল কেমন এক রকম হইয়া উঠিলেন। কিছুই ভাল লাগিল না। গান, বাদ্য, রোহিণী, কিছুই তাঁহাকে স্থির করিতে পারিল না। গোবিন্দলাল কাঁদিতে লাগিলেন। রোহিণীর উপর তাঁহার কিছু রাগ হইল—যে কারণে নগেন্দ্রনাথ একদিন কুন্দনন্দিনীর উপর রাগ করিয়াছিলেন—গোবিন্দলালও সেই কারণে রোহিণীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। ভ্রমরের সহিত তাঁহার এরূপ ঘটনার কারণই'ত রোহিণী। সেই ত সব অনর্থের মূল।

নিশাকর বড় দুষ্ট লোক। সে সময় বুঝিয়া এ রাগ প্রশ্রয় দিল। আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রোহিণীকে ধরিয়া লইয়া গোবিন্দলাল শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "রোহিণি।"

রোহিণী বলিল, "কেন!"।

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে।

রো। কি?

গো। তুমি আমার কে?

রো। কেহ নই, যত দিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী। নহিলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়া ছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণি, যে তোমার জন্য ভ্রমর,—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম?" এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন! ক্রোধ ক্রমে বাড়িতে লাগিল, শেষে যাহা হইল তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

এই গোবিন্দলাল রোহিণীর নিকট তাহার প্রসক্তির কথা শুনিয়া এক দিন বিচলিত হন নাই—"তাঁহার আহ্লাদও হয় নাই—রাগও হয় নাই।"

আজ তিনি রোহিণীকে দুশ্চারিণী অথবা অন্যাসক্তা জানিয়া দুঃখিতও হইলেন, ক্রুদ্ধও হইলেন!

গোবিন্দলাল রোহিণীকে কেন মারিলেন, তাহা গোবিন্দলালও কতক বলিয়াছেন, আমরাও কতক বলিয়াছি। এখন গ্রন্থকার নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভাল বাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়া ছিলেন, যে এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণ পীড়িত বাসুকি নিশ্বাস নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি ভাণ্ড নিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন, যে এ হৃদয় সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্ব পরিজ্ঞাত স্বাদ-বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়-সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্ত পুষ্টিকর, সর্ব্ব রোগের ঔষধ স্বরূপ, দিবা রাত্রি স্মৃতি-পথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত-স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল।" রোহিণীর প্রণয় বহিরিন্দ্রিয়গত—রূপই তাহার কারণ। ভ্রমরের প্রণয় হৃদয়গত, গুণই তাহার কারণ। তাই রোহিণী বাহিরে, ভ্রমর অন্তরে।

গোবিন্দলালের ধর্ম্মের কথা আর কি বলিব! তিনি স্বর্গ হইতে নরকে নামিয়া গিয়াছিলেন। সহৃদয় গোবিন্দলাল ভ্রমরকে কাঁদাইলেন, রোহিণীকে মারিলেন। ধার্ম্মিক গোবিন্দলাল, ধর্ম্ম পরের জন্য ভাবিয়া অনর্থক মনে করিলেন। আত্মসংযমের কথা আর কিছু বলিতে হইবে কি? কিন্তু এই হইতেই তাহার মনের গতি ফিরিবে—অনুতাপ আরম্ভ হইবে।

রোহিণীর উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর আসিয়া গোবিন্দলালের হৃদয় মধ্যে মেঘ কাটিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। এক এক দিনে যেন এক এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া সে মেঘ কাটিতে লাগিল।

অষ্টম অধ্যায় ঃ—ভ্রমরের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত এই অধ্যায় বিস্তৃত।

এই অধ্যায়ে রোহিণী সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিবার নাই। রোহিণীকে হত্যা করিয়া গোবিন্দলাল, কিছু বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের সাহায্যে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন।

গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। সেখানকার যাহা কিছু ছিল, বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়া ছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন ছয় বৎসরের পর, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

"গোবিন্দলাল কালি, কলম, কাগজ লইয়া ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাঁচিয়া আছে তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তারপর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে? তাহা হইলেই জানিব যে ভ্রমর নাই।

"কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন বলা যায় না। তারপর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনা দোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে?" গোবিন্দলাল যে পত্র খানি লিখিলেন, পাঠকবর্গকে এখন একবার তাহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। সে পত্রখানি গোবিন্দলালের হৃদয়ের পত্র, দুঃখের পত্র, অনুতাপের পত্র।

যথাকালে এ পত্রের উত্তর আসিল। অন্যান্য কথার উত্তর লিখিয়া ভ্রমর লিখিলেন,

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রা-

লয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহায় আমার সন্দেহ নাই।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। তিনি তখন কেন বাটী ফিরিয়া গেলেন না তাহা গ্রন্থকার এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"গোবিন্দলাল তাহা (ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষমা চাহিতে) পারিলেন না। কতকটা অহঙ্কার—পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়—পাপ সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই।গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।"

গ্রন্থকার আবার লিখিলেন,

"তবু সেই পুনঃ প্রজ্বলিত, দুর্ব্বার, দাহকারী, ভ্রমর-দর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে?"

আমরা দেখিলাম, ভ্রমরের স্মৃতির সঙ্গে গোবিন্দলালের শাস্তিও প্রবল হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

নবম অধ্যায় ঃ—গোবিন্দলালের জীবনের এই শেষ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দলাল নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে নিজ শয্যাগৃহে সাত বৎসরের পরে মুমূর্ষু ভ্রমরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল—দুজনেই কাঁদিতে লাগিলেন। একজনও কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমর নীরবে প্রাণ ত্যাগ করিল।

রাত্রে ভ্রমরের মৃত্যু হইল। প্রাতে গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলেন। সেখানে উদ্যানের কিছুই ছিল না। তবু অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল তথায় রহিলেন। গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে বারুণী-তটে—তাঁহার জীবন-নাটকের প্রধান দৃশ্য স্থলে—উপস্থিত হইলেন।

"একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

প্রচণ্ড সূর্য্যতেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্র অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তাহার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল—প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়া ছিল—আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখন বোধ হইতে লাগিল ভ্রমর কথা কহিতেছে—কখন বোধ হইতে লাগিল রোহিণী কথা কহিতেছে—কখন বোধ হইল তাহারা দুইজনে কথোপকথন করিতেছে। শুষ্কপত্র নড়িতেছে—বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে—বনমধ্যে বন্য কীট পতঙ্গ নড়িতেছে—বোধ হইল রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে—বোধ হইল ভ্রমর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিণী গান করিতেছে। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।

"বেলা দুই প্রহর—আড়াই প্রহর হইল—গোবিন্দলাল সেইখানে—সেই ভগ্ন পুত্তলপদতলে—সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর—সার্দ্ধ তিন প্রহর হইল—অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেই খানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে—সেই ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই—চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেই খানে সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে,

"এই খানে!"

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এই খানে কি ?"

যেন শুনিলেন রোহিণী বলিতেছে,

"এমনি সময়ে !"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "এই খানে, এমনি সময়ে কি রোহিণী ?" মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল, "এই খানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে

"আমি ডুবিয়াছিলাম !"

গোবিন্দলাল, আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমি ডুবিব ?"

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন,

"হাঁ আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে।"

"প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।"

গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পর দিন প্রভাতে, যে খানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেই খানে তাঁহার মৃত দেহ পাওয়া গেল"

আমরা এই গ্রন্থের তিনটি স্থলে, গ্রন্থকারের কবিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির অতিশয় পরিচয় পাই। এই তিনটি স্থল, কাব্যাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রথমটি —গোবিন্দলালের ও রোহিণীর প্রথম সন্দর্শন স্থল। দ্বিতীয়টি—রোহিণীর জল-নিমজ্জন স্থল। তৃতীয়টি—এই। ভ্রমরের মৃত্যুতে কান্না না আসিয়া যায় না সত্য, কিন্তু শিল্পাংশে এ সব স্থলের সহিত তাহার তুলনা হয় না। তাহার প্রশংসা কেবল করুণ রসের অবতারণায়।

গোবিন্দলাল যে দারুণ কষ্টে উন্মাদগ্রস্ত হইলেন,তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার দুঃখ বর্ণনা করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু একটি

কথা বলিতে হইবে। দেখা যাইতেছে; গোবিন্দলাল এখনও রোহিণীকে ভুলিতে পারেন নাই,ইহার কারণ কি? রোহিণীকে তিনি হত্যা করিয়াছেন—শুনিয়াছি, হত্যাকারী, হত্যাকার্য্যে সম্যক্ অভ্যস্থ না হইলে, হত ব্যক্তি সর্ব্বদাই তাহার মনে উঠিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করে। এতদ্ভিন্ন আরও একটি কারণ আছে। লোকে মিত্রকে ভুলিতে পারিলেও শত্রুকে ভুলিতে পারে না। রোহিণীই তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনার কারণ—রোহিণীর জন্যই তাঁহার ভ্রমর মরিয়াছে। ভ্রমরকে মনে পড়িলেই ত তাহাকে মনে না করিয়া পারা যায় না। তাই তখনও 'রোহিণী বাহিরে, ভ্রমর অন্তরে'। আর, রোহিণীকে সম্যক্ শাস্তি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া সহৃদয় গোবিন্দলালের একটু কষ্টও হওয়া আশ্চর্য্য নহে। রোহিণীও ভুলিবার বস্তু নহে।

আর একটি কথা রহিয়া গেল। রোহিণী গোবিন্দলালকে বলিতেছে, "প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।" একদিন এইখানেই রোহিণী ডুবিয়া গিয়াছিল, তাই গোবিন্দলালের মনে এইরূপ বিকার হইল। এটি ভাব সাহচর্য্যের ফল। গোবিন্দলাল সেই বারুণীর জলে, ডুবিয়া মরিলেন। এই খানেই তাঁহার আর একদিন আর এক রকমের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এই পুকুরটি যেন তাঁহারই জন্য হইয়াছিল। গোবিন্দলালের বারুণীজলে ডুবিয়া মরাতে তাঁহার মৃত্যুটি আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

আমরা আমাদিগের অধ্যায় বিভাগ কিরূপে করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

প্রথম অধ্যায়ে—গোবিন্দলালের ভ্রমরের প্রতি একান্তরতি—ধর্ম্মে সম্যক্ অনুরাগ—রোহিণীর প্রতি দয়ার স্ফুরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—রোহিণীর প্রতি তাঁহার আসক্তির ঈষৎ প্রকাশ—দয়ার আধিক্য—ভ্রমরের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বভাবের ঈষৎ বিকার।

তৃতীয় অধ্যায়ে—ভ্রমরের প্রতি হৃদয়ের একটু অবিশ্বাস সঞ্চার—ধর্ম্মানুরাগ পূর্ব্ববৎ—রোহিণীর প্রতি বাসনার স্ফুটন—আত্মসংযমের আবশ্যকতা ও চেষ্টা।

চতুর্থ অধ্যায়ে—ভ্রমরের প্রতি ক্রোধ ও অভিমান—ধর্ম্মজ্ঞানে ভয়ানক ভ্রান্তি—আত্মসংযমে অনাবশ্যকতা জ্ঞান—রোহিণী-প্রসক্তির প্রগাঢ়তা—প্রচ্ছন্ন, সংযমিত রূপতৃষ্ণার পূর্ণ বিকাশ।

পঞ্চম অধ্যায়ে—ভ্রমরের প্রতি বিরক্তির সঞ্চার—প্রবল পাপানুরাগ মধ্যে

ধর্ম্মের ঈষৎ ক্ষণিক বিকাশ—জড়বৎ পাপস্রোতে ভাসিয়া যাওয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে—ভ্রমর বিস্মৃতি চেষ্টা—পাপ—রোহিণীর সম্যক্ উপভোগ। এই অধ্যায়ই গোবিন্দলালের জীবনের crisis.

সপ্তম অধ্যায়ে—ভ্রমর স্মৃতির ঈষৎ সঞ্চার—রোহিণীর প্রতি বিরক্তি—পাপানুষ্ঠান জনিত অনুতাপারম্ভ।

অষ্টম অধ্যায়ে—ভ্রমর স্মৃতির বিকাশ—ধর্ম্মবোধ—ভ্রমবোধ—পাপের শাস্তি আরম্ভ।

নবম অধ্যায়ে—ভ্রমরের জন্য উন্মত্ততা—রোহিণী হত্যার জন্য উন্মত্ততা, শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত।

ইহা দেখিলে, কিরূপে ধীরে ধীরে একটির সঞ্চার ও অন্যটির বিনাশ হইল, বেশ বুঝা যায়। ভ্রমর গুণ, রোহিণী রূপ। ধর্ম্মানুরাগ গুণের দিকে।

আমরা গোবিন্দলালের চরিত্র যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে মোটের পরে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। গোবিন্দলালের চিত্র অঙ্কণে কবির কিরূপ নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা একটু চিন্তা সহকারে বাহ্যিক ঘটনাগুলি ও তাহা ঘটিবার সময়ে গোবিন্দলালের মনের ভাবগুলি তুলনা করিয়া দেখিলে অতি সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইহার একটি ঘটনাও নিরর্থক নহে—গোবিন্দলালের একটি ভাবও অস্বাভাবিক নহে। আমরা গোবিন্দলালের স্বাভাবিক চরিত্র (যাহা গ্রন্থকার আমাদিগকে পূর্ব্বে দেখাইয়া দিয়াছেন) হইতে অধঃপতন পর্য্যন্ত স্তরগুলি অতি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। গোবিন্দলাল চন্দ্রশেখর বা প্রতাপের ন্যায় মহৎ নয় সত্য, কিন্তু চিত্রনৈপুণ্য গোবিন্দলালে যাহা আছে, তাহা বুঝি উহার কিছুতেই নাই। যাহা হউক, তুলনায় সমালোচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে—তাহা হইলে আমাদিগের নগেন্দ্রনাথকে এ সময়ে ভুলিতে পারিতাম না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যুবক মাত্রেরই পাঠ্য—এখনকার দিনে, 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষাও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অধিক উপকারী।

গোবিন্দলালের চরিত্র হইতে আমরা যে কয়েকটি প্রধান নীতি উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, তাহা এই—

১। ধর্ম্ম আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য—পরের জন্য নহে। ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মেরই জন্য, অন্য কিছুর

জন্য নহে। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহেনা, অন্য কোন কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে।

ইহাই "কৃষ্ণকান্তের উইল"র একটি প্রধান নীতি—গোবিন্দলালের চিত্রে সর্ব্ব প্রধান। ইহা বুঝিতে না পারিয়া গোবিন্দলালের কি দশা ঘটিয়াছিল—ইহার উপর নির্ভর করিয়া ভ্রমরের অপরাধ গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি কিরূপে আপনাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অধঃপাতিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি, এখন বর্ত্তমান সময়ে ইহার আবশ্যকতা কতদূর তাহা দেখাইতে চাহি।

আজ কাল এমন একটা ধর্ম্মের দল হইতেছে, যাহাতে অবিবাহিতের অপবিত্রতা বড় দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। এটি বিলাত হইতে আমদানি—ইহাদের প্রধান কথা এই যে, বিবাহের প্রতিজ্ঞা বা শপথ যদি না থাকিল, তবে সেরূপ অপবিত্রতায় কোনও দোষ ঘটে না। বিবাহিতেরা যে পবিত্র থাকেন, তাহা তাঁহাদের বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য—ধর্ম্মের জন্য নহে। যেখানে পত্নীগণের কোন প্রকার অপরাধ পাওয়া যায়, সেখানে অন্য স্ত্রী নিরত হইলে, কোনও ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ করা হয় না। গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে দেখাইয়াছেন যে, তা থাক্ তোমার অন্য দশটা বাহিরের কারণ থাকিলেও ইহা তোমার পাপ মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। ইহার উপযুক্ত যে শাস্তি—ইহকালের যে যন্ত্রণা, তাহা তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। ধর্ম্মাচরণ কাহারও জন্য নহে। কর্ত্তব্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহে।

২। যখন পাপাচরণে মন আকর্ষিত হয়, তখন আমাদিগের সুমতিও কুমতি রূপ ধারণ করে; আমাদিগের বিচার শক্তিও প্রতারণা করিতে চাহে। যাহা পূর্ব্বে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া থাক, তাহা পাপের আকর্ষণ দেখিয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা হইতে পারে, কিন্তু তাহা সর্ব্বথা ত্যজ্য।

যে গোবিন্দলাল "কি জানি যদি দুশ্চরিত্রা হয়" এই শঙ্কা করিয়া রোহিণীর নিকট যাইতে চাহেন নাই—সেই গোবিন্দলাল যখন পাপ-পথে গমন করিতে সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন তখন কি ভাবিতেছেন, শুন—"রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির

রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপত মোহের জন্যই হইয়াছিল।"

'পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে।'

৩। আমাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরে যে সকল কুপ্রবৃত্তি লুক্কায়িত থাকে, বাহ্যিক অবস্থার সংঘর্ষণে তাহা অতি ধীরে আমাদিগের অজ্ঞাতসারে বিকশিত হইতে থাকে। সম্যক্ প্রবল হইয়া না উঠিলে, আমরা উহার অস্তিত্ব গ্রাহ্য করিতে চাহি না; কিন্তু প্রথম হইতেই সূক্ষ্মদর্শিতা ও সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, পরে ইহাদিগকে দমন করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে।

গোবিন্দলালের পাপটি দয়া উপলক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে হৃদয়াভ্যন্তরে বর্দ্ধিত হইতেছিল। গোবিন্দলাল প্রথমে তাহা পাপ বলিয়া জানিতে পারেন নাই। যখন এই পাপবল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন গোবিন্দলাল ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলেন। কিন্তু তাহা তখন এত দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহা উন্মূলিত করিতে আর তাঁহার সাধ্য ছিল না। গোবিন্দলাল যাহা শিখাইয়াছেন, তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা এই।

সুন্দরী যুবতী রমণীর প্রতি দয়াটা আমাদিগের একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। উহাতে এমন কিছু থাকিতে পারে, যাহা থাকা কোন মতেই উচিত নহে। যেখানে এইরূপ সম্ভব, নির্দ্দয় না হইলেই যথেষ্ট হইল। দয়ার বাহাদুরি দেখাইতে গিয়া অনেককে মারা পড়িতে দেখা যায়। গোবিন্দলাল যাহা সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এই।

৪। প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। তুমি কখনও আপনাকে এত সাধু মনে করিওনা যে, তুমি প্রলোভনের শক্তি হইতে অতীত। সাবধানে না থাকিলে অতি সাধুরও পতন হইতে পারে।

গোবিন্দলালের কুপ্রবৃত্তির সম্যক্ বিকাশের প্রধান কারণ রোহিণীর জল-নিমজ্জন দিবসের ঘটনা। ইহার বিশেষ অর্থ যাহা, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সাধারণ ব্যাখ্যা এই:—প্রাণান্তেও অসংবৃতা, নিঃ-

সম্পর্কীয়া, যুবতী রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করিবে না। সাধু লোকেরও ইহাতে সাবধান হওয়া উচিত।

৫। রূপ বাহিরের বস্তু—গুণ অন্তরের। রূপতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইলে, রূপ বিরক্তিকর হইয়া উঠে, গুণে পরিতৃপ্তি নাই—তাহাতে বিরক্তি হইতে পারে না।

এই জন্য রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে হত্যা করিলেন—ভ্রমরের জন্য উন্মত্ত হইলেন। কিন্তু গুণজ প্রণয়ও চিরস্থায়ী নহে, যাহার গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আজ তাহার গুণ হ্রাস হইতে পারে। যদিও তাহা ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট হয়, তবু যে তাহা হয় না একথা বলিতে পারি না। গুণজ প্রেম হইতেও উচ্চতর আর এক শ্রেণীর প্রণয় আছে সেটি কর্ত্তব্যজ। যাহাকে ভালবাসিতেছি, তাহার রূপ গুণ থাক্ আর নাই থাক্, আমার একান্ত কর্ত্তব্য যে তাহাকে ভালবাসিব—এইরূপ বিশ্বাস কর্ত্তৃক যে প্রণয় পুষ্ট হয়, তাহা চিরস্থায়ী। বঙ্গীয় ললনাদিগের ভক্তি ও প্রণয় প্রায়ই এই শ্রেণীর। গোবিন্দলাল একদিন এ কথা ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন।

এই সকল প্রধান নীতি ব্যতীত ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি নীতি আছে; তাহা অনেক গ্রন্থেই থাকে। যথা:—অল্প কারণে বিরক্তি প্রণয়ের অতি প্রবল শত্রু। পরদারনিরতি প্রভৃতির ফল অনেক সময়েই হত্যা ও উন্মত্ততা। অসাধুচরিত্রা রমণীর নিকট প্রকৃত প্রণয় পাওয়া যায় না। (অনেক সময়ে এইটিতে অনেকের বড় ভ্রম হইয়া পড়ে। কোন কালেই রোহিণীতে ভ্রমরত্ব থাকিতে পারেনা)। স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য, অন্যস্ত্রী আসক্ত হওয়া, আর সামান্য রোগে উৎকট ঔষধ ব্যবস্থা করা, প্রায় তুল্য কথা। (এটি প্রথম নীতিটির অন্তর্গত বটে—অনেকে ইহাতেও ভয়ানক ভুল করিয়া থাকেন)।

তবে, প্রথমোক্ত পাঁচটি নীতিসূত্র যেরূপ অতি পরিস্কাররূপে প্রমাণিত হইয়াছে, আর গুলি তাহা হয় নাই। কেবল নীতি-সূত্রের উল্লেখই কাব্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে—তাহার জন্য ভিন্ন গ্রন্থ রহিয়াছে। এই নীতিসূত্র গুলি কাব্যগ্রন্থে এইরূপ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণীকৃত হওয়া চাই যে, পাঠকবর্গ তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন। কঠোর যুক্তি দ্বারা প্রমাণ অপেক্ষা কাব্য-চাতুর্য্য দ্বারা প্রমাণ বলবত্তর। আর, এসব নীতিসূত্র এইরূপে ভিন্ন, অন্যভাবে প্রমাণ

করা যায়ও না। ইহা প্রমাণ করিতে, মানব-জীবনে তাহার ফল এরূপভাবে দেখান চাই যে, পাঠকবর্গ তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে করিতে পারেন। আমরা উপরে যে সকল নীতির উল্লেখ করিলাম, গোবিন্দলালের চরিত্রটি ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাতে এগুলি অতি চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রদ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে, বোধ হইবে। বাস্তবিকই "কাব্য গ্রন্থ মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা মাত্র।"

২। ভ্রমর।

মাত্র দুইটি ভাব লইয়া ভ্রমর সৃষ্ট হইয়াছে। পতিভক্তি—পতিপ্রেম ও ধর্ম্মানুরাগ—পাপে ঘৃণা। এই দুইটি ভাবের প্রথমটি অতি উজ্জ্বল, পরিস্কার সুতরাং সহজবোধ্য—দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, জটিল, সুতরাং কষ্ট-বোধ্য। এই দুইটি ভাবের অপূর্ব্ব মিশ্রণ দ্বারাই ভ্রমরের মন ও হৃদয় গঠিত দেখিতে পাই—আমরা তাহা ক্রমে দেখাইতেছি।

'কৃষ্ণকান্তের উইলের' দশম পরিচ্ছেদে আমরা ভ্রমরকে প্রথম দেখিতে পাই—দেখিতে পাই, একটি উজ্জ্বল, পরিস্কার, কোমল, শ্যামকান্তি,ক্ষীণ লতা একটি স্বর্ণকান্তি সুগঠন মহীরুহোপরি এলাইয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আমাদিগের ভ্রমর কিছু কালো।

ভ্রমর বালিকা—বয়স সপ্তদশ বর্ষ মাত্র। বাল্যকালেই—আট বৎসর বয়সেই, গোবিন্দলালের সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই বাল্যবিবাহটির কথা বলিয়া গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে ভ্রমরের সহিত গোবিন্দলালের সম্বন্ধ গুলি ও ভ্রমরের চরিত্রটি সুন্দর রূপে দেখাইতে পারিয়াছেন। ভ্রমর কেবল গোবিন্দলালের পরিণীতা পত্নী নহে, প্রিয়তমা শিষ্যাও বটে। ভ্রমর গোবিন্দলালেয় হৃদয়ের ছায়া—ধর্ম্মানুরক্ত, সহৃদয়, প্রেমিক স্বামীর, ধর্ম্মানু-রাগিণী, সহৃদয়া, প্রেমিকা ভার্য্যা।

এইরূপে ভ্রমর চিত্রের স্থূল রঙ্গুলি বর্ণনা করিয়া, আমরা তাহার চরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলির কারিগরি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এক দিন যখন ভ্রমর গোবিন্দলালের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, অন্তপুর মধ্যে চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল। "চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না"। ভ্রমরকে দেখিয়া তাহারা বড় গোলযোগ বাড়াইল—কিছুতেই ভ্রমর তাহাদিগকে

শান্ত করিয়া ঘটনাটি ভাল করিয়া শুনিতে পারিল না। বহুকষ্টে মাত্র এই টুকু উদ্ধার করিল যে, গত রাত্রে কর্ত্তা মহাশয়ের শয়ন কক্ষে একটা চুরি হইয়াছে—সে চোর আর কেহই নহে, রোহিণী। কর্ত্তা মহাশয় তাহাকে গারদে রাখিয়াছেন।

"ভ্রমর যাহা শুনিল তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিল। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?

ভোমরা বলিল, 'না'।

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি?

গো। তা সমায়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল, বলিল 'তুমি আগে।'

ভ্র। কেন আগে বলিব?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া, নীরব রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যত দূর বিশ্বাস ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায় তত দূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে 'সে নির্দ্দোষী আমার এই রূপ বিশ্বাস।' গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আমি বলিব কেন তুমি রোহিণীর দিকে?'

ভ্র। কেন?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে। ভ্রমরা কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল 'যাও।' গোবিন্দলাল বলিল 'যাই।' এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন। ভ্রমর তাহার বসন ধরিল—'কোথা যাও?'

গো। কোথা যাই বল দেখি?

ভ্র। এবার বলিব।?

গো। বল দেখি।

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

'তাই' বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখচুম্বন করিলেন। পরদুঃখ-কাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখ চুম্বন করিলেন।"

প্রণয়ের কি সুন্দর, স্নিগ্ধ, মধুর, মোহন ছবি দেখিতে পাইলাম। ইহা ব্যাখ্যা করা যায় না—ব্যাখ্যা করিলে ইহার কোমলতা নষ্ট হয়। যাহা ব্যাখ্যা করিবার, গ্রন্থকার তাহা করিয়া দিয়াছেন। গোবিন্দলালের বিশ্বাসে যে ভ্রমরের বিশ্বাস—ভ্রমর যে ঠিক গোবিন্দলালের ছায়া, তাহা গ্রন্থকারই বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমরের সেই, বলি বলি বলিয়া না বলিতে পারার ভাব, আর ভ্রমরের সেই কোপ কুটিল কটাক্ষের অর্থ আমরা ব্যাখ্যা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ইহা যত সহজে বুঝা যায়,তত সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না।

কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে ভ্রমর, রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। 'ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে,এজন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না।' গোবিন্দলালকে দেখিয়া ভ্রমর সে দায় হইতে উদ্ধার পাইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে হবে।'

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।

"ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'রাঁধুনি ঠাকুরঝি, রাঁধতে রাঁধতে একটি রূপ কথা বল না?' "

এই ভ্রমরের চরিত্র আমাদিগকে বড় লজ্জায় ফেলাইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা কেবল পাতাকে পাতা উদ্ধৃত করিয়াই দিতেছি, তৎসম্বন্ধে কিছুই একটা বলিতেছি না। বলিব কি মাথামুণ্ড? সেই 'অমিয়ে মাখন ছানা' ভাব, কি ব্যাখ্যাকারকের কঠোর হস্তে প্রতি-তুলিত হইতে পারে? আমরা মাত্র, এক স্থলে সব গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারি, ব্যাখ্যা করিতে পারি না। সেইরূপ করিয়া রোহিণীকে লইয়া ভ্রমরের বসায়, সেইরূপ করিয়া গোবিন্দলালকে দেখিয়া তাহার আনন্দিত হওয়ায়, গোবিন্দলালের কথা শুনিয়া সেই রূপ করিয়া ছুটিয়া যাওয়ায়, যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি কি? তাই বলিতেছিলাম ভ্রমর আমাদিগকে বড় লজ্জায় ফেলাইয়াছে।

আর একসময়ে গোবিন্দলাল বসিয়া রোহিণীর কথা ভাবিতেছেন— রোহিণীর রূপের কথা নয়, তাহাকে কি প্রকারে উদ্ধার করিবেন, সেই কথা ভাবিতেছেন, ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

"বলিল, 'ভাবছ কি?'

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কালোরূপ।

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল 'সে কি? আমায় ভাব্‌ছনা? আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?'

গো। আছেনা ত কি? সর্ব্বে সর্ব্বময়ী আর কি? আমি অন্য মানুষ ভাব্‌তেছি।

ভ্রমর, তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাসিমাখা স্বরে, জিজ্ঞাসা করিল, 'অন্য মানুষ—কাকে ভাব্‌ছ বলনা?'

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া ?

ভ্র। বল না!

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি কর্‌ব—বলনা।

গো। যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়া হলো কি না।

ভ্র। দেখ্‌বো এখন—বলনা কে মানুষ ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা! রোহিণীকে ভাব্‌ছিলাম।

ভ্র। কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে ?

গো। তা কি জানি।

ভ্র। জান—বলনা।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না ?

ভ্র। না। যে যাকে ভালবাসে সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি—তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।

ভ্র। মিছে কথা—তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাকেও তোমার ভালবাস্‌তে নাই—কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে বলনা ?

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে ?

ভ্র। না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন ?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ—যা কর্‌তে নাই তাই করে।

গো। আমারও পোড়ারমুখ। যা কর্‌তে নাই তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।

ধাঁ করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, 'আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা ?'

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, প্রফুল্ল নীলোৎপলদলতুল্য মাধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া, মৃদু মৃদু অথচ গম্ভীর, কাতর কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, 'মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভালবাসে।'

তীব্র বেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল,

'—আবাগী—পোড়ারমুখী—বাঁদরী—মরুক! মরুক! মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!'

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, 'এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।'

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'দূর তা কেন—তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?'"

গোবিন্দলালও এ কথার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ভ্রমর তখন ক্ষীরোদা নামক একজন চাকরাণীকে ডাকিয়া রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইল যে, তাহার বারুণী পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া মরা উচিত। ক্ষীরোদা বলিয়া আসিল। গোবিন্দলাল কিছু চিন্তিত হইলেন—এরূপ ঘটনায় অতি কুফল ঘটিতে পারে, তাহা তিনি বুঝিতেন। "বলিলেন 'ছি ভোমরা।' ভোমরা বলিল, ভাবিও না সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে?'"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, ভ্রমর বালিকা—চপলা—আমোদপ্রিয়া। স্বামীর পরে তাহার বিশ্বাস অনন্ত, অটল, যেন আপনার অস্তিত্বের সহিত দৃঢ়ভাবে গ্রথিত। তাহার হৃদয়খানি যেন দয়ার খনি—কোমলতার উৎস, প্রেমের স্বর্গ। সুখের নন্দন কানন,—মধুরতার বিলাস-ভবন—সৌন্দর্য্যের প্রতিমা। রোহিণীকে লইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পাছে, এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর তাহাতে কান্না আসে। পাছে গায়ে হাত বুলাইতে হস্তের কঠোরতায় তাহার ক্লেশ হয়—দুঃখ দূর করিতে অজ্ঞানতা বশতঃ, সংসার-বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ, তাহার দুঃখ বৃদ্ধি হয়। স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসের ভাবনাও তাহার নিকট লজ্জার বিষয়। যখন গোবিন্দলাল বলিলেন "আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।" "ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল 'রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধতে রাঁধতে একটী রূপকথা বল না।'" আমরা দেখিলাম যেন বালিকা ভ্রমর এইমাত্র

অপ্রস্তুত হইয়া গোবিন্দলালের নিকট হইতে ছুটিয়া পলাইল। ভ্রমর স্বামীর নিকট প্রগল্‌ভা,ব্যাপিকা, রসিকা যাহাই থাকুক না কেন, অন্যত্র গুরুজনের নিকট বিনীতা, শান্তস্বভাবা, লজ্জাশীলা। ভ্রমর শ্বশুরের নিকট রোহিণীর জন্য অনুরোধ করিতে পারিল না—ছি, লজ্জা করে! এ লজ্জার অর্থ বড় সুন্দর। এ লজ্জার অর্থ 'বাহাদুরি' দেখাইতে লজ্জা —হৃদয়ের সৌন্দর্য্যটুকু দেখাইতে লজ্জা। ভ্রমর গোবিন্দলালেরই ন্যায় মনে মনে রোহিণীর উদ্ধার ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু তাহা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না—গোবিন্দলাল বলিলেই ত হইতে পারে?—এই লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়াই ভ্রমর আর একদিন রোহিণীকে কেন বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা গোবিন্দলালকে বলিতে পারে নাই। সে কিরূপে বলিবে যে, "তোমার বিশ্বাসেই আমার বিশ্বাস"? সে তাহা পারে না—লজ্জা করে, কিসে যেন মুখ চাপিয়া ধরে। বুঝিতে পারিলাম, ভ্রমর বয়সে বালিকা হইলেও, জ্ঞানে বর্ষীয়সী। প্রেমিক হৃদয়ের নিকট ভালবাসা ক্রীড়ার সামগ্রী। সদা সর্ব্বদা ইহা লইয়া খেলা করিতে করিতে, এ সম্বন্ধে তাহাদের এমনই একটা স্বতঃ জ্ঞান জন্মে, যে, দার্শনিকের তীক্ষ্ণদর্শী প্রতিভাও তাহার নিকট মস্তক অবনত করে। গোবিন্দলাল যখন রোহিণীর আসক্তির কথা ভ্রমরকে জানাইলেন, ভ্রমর রোহিণীকে গালি পাড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল বলিলেন "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক,এখনও ত কেড়ে নেয়নি?" "ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল.'দূর তা কেন—তা কি পারে, তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?' ভ্রমর ইহা বুঝে—বুঝে যে এই রূপ ঘটনা বড় সহজ নহে। আবার ভ্রমর এক স্থলে বলিতেছে 'ভাবিও না—সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে?'। ভ্রমর বুঝিয়াছিল যে এ আকাঙ্ক্ষা লইয়া, এ আশা লইয়া মানুষ মরিতে পারে না—তাই সে সাহস করিয়া রোহিণীকে মরিতে বলিয়াছিল। সেই বলাতেই বা তাহার চিত্তের কত সৌন্দর্য্য, কত সরলতা, কত দ্বেষশূন্যতা, প্রকাশ পাইয়াছে! ভ্রমর মাধুর্য্যের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

এ সব কথা, যাহা হউক, একরকম বুঝান যায়; কিন্তু ভ্রমরের সে পতি-প্রেম, সে স্বামিভক্তি আমরা কিরূপে বুঝাইব? যাহা ভ্রমরের প্রতি কথায়, প্রতি অক্ষরে, প্রতি চাহনিতে, প্রতি কার্য্যে, সুস্পষ্ট, সুপ্রকাশিত, সুব্যক্ত হইয়া ফুটিয়া পড়িত, অকবির চক্ষু লইয়া তাহা তোমাদিগকে কিরূপে

দেখাইব? সে আদরের ভাব, যাহা দেখিলে বোধ হইত যেন সংসারটা আসিয়া জমাট হইয়া তাহার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে—বাহিরে অনন্ত শূন্য মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে—সে আবদারের প্রণালী, যাহাতে বলিত যে, পৃথিবীতে যত কিছু পবিত্রতা আছে, তাহা বালকেই রহিয়াছে, যত কিছু আনন্দ আছে, তাহা বালকেই আছে, যত কিছু বিশ্বাস আছে, তাহা বালকেই আছে; যাহাতে বলিত যে, জ্ঞান না ভুলিলে আনন্দানুভব করা যায় না—বয়স না ভুলিতে পারিলে সুখ কি বুঝা যায় না, বিস্মৃতি অভ্যাস না করিলে বিভোর হওয়া যায় না—সে বিশ্বাসের গাঢ়তা, যাহা দেখিয়া বোধ হইত যে যত দিন ইহা থাকিবে, ততদিন তাহার জীবন থাকিবে, ইহা ছাড়া তাহার জীবন এক-দিনও যেন থাকিতে পারেনা—সে প্রেমের গঠন, যাহার অর্দ্ধেক ভালবাসা অর্দ্ধেক ভক্তি, অর্দ্ধেক স্নেহ অর্দ্ধেক বিশ্বাস, অর্দ্ধেক হৃদয় অর্দ্ধেক জ্ঞান, কেমন করিয়া বুঝাইব, সে ভালবাসা কিরূপ? সে ভক্তি কিরূপ? কেমন করিয়া বুঝাইব সে "দূর", সে "যাও", সে কিল, সে চড়, সে আদর, সে চুম্বন, ভ্রমরকে কেমন প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে? তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। ভ্রমরের সেই কথা 'সে কি? আমায় ভাব্‌ছনা? আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?', সেইরূপ ভাবে গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখ চুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাসিমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করা 'অন্য মানুষ—কাকে ভাব্‌ছ বলনা?', গোবিন্দলালের নিকট সে কথা শুনিতে সেইরূপ করিয়া আগ্রহ প্রকাশ" '(রাগ) করি কর্‌ব—বলনা' 'দেখ্‌বো এখন—বলনা কে মানুষ?' 'জান—বলনা' যে, ভ্রমরের কি মধুর, কোমল, সস্নেহ ভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা কি বুঝান যায়? সেই 'যে যাকে ভাল-বাসে সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি, তুমি আমাকে ভাব' 'তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাকেও তোমার ভালবাস্‌তে নাই' যে, ভ্রমরের স্বামিস্নেহে বিশ্বাস কতদূর প্রকাশ করিয়াছে, তাহা কি কখন বুঝান যায়?

সে প্রণয়ে যে কোমলতা আছে, যে মাধুরী আছে, যে বিস্মৃতি আছে, যে উন্মত্ততা আছে, ভাষায় তাহা ব্যক্ত হয় না, সঙ্গীতে তাহা ব্যক্ত হয় না, জ্যোৎস্নায় তাহা ব্যক্ত হয় না, বসন্তানিলে তাহা ব্যক্ত হয় না। কেবল, কেবল সেই চাহনিতে, সেই কথায়, সেই ভাবে, সেই ভঙ্গিতেই তাহা ব্যক্ত হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম যে, ভ্রমর আমাদিগকে কিছু লজ্জায় ফেলাইয়াছে।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল,

'আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?'

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখন কি থাকিনা?

ম। থাক—কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে?

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না?

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে—সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি।—আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইয়াছে। ভ্রমর এই বলিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিল না।

গোবিন্দলাল বলিলেন—'দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না ভ্রমর।'

"ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল 'তবে তাই—দুই বৎসর পরেই বলিও—আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলেনা—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।' যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল,—কোথাও কিছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলে—ভোমরা বোধ করিল তাহার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি—আমার স্বামী রাগ করিবেন।' অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গিয়া কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল। কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।"

এইখানে ভ্রমর-জীবনের প্রথমাঙ্ক অভিনীত হইল। দুঃখ আরম্ভ হইল। স্বামী আজি তাহাকে মনের কথা বলিলেন না—তাঁহার মুখে স্পষ্ট বিষাদ-চিহ্ন, অন্তর্বিপ্লবের চিহ্ন প্রকাশিত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি সেই দুঃখ, সেই ঘটনা কিছুই ভ্রমরকে বলিলেন না! ভ্রমর মর্ম্মস্পৃক দুঃখে ব্যথিত হইল,

কিন্তু তবু মনে করিল 'আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি —আমার স্বামী রাগ করিবেন।' এখন বেশি দুঃখটা হইতেছিল কিসের? না, গোবিন্দলালের কঠোরতা, নির্ম্মমতার কথা ভাবিয়া—ভ্রমরকে তিনি কি প্রকারে তাহা না বলিয়া পারিলেন, সেই কথা ভাবিয়া; কিন্তু ছি! ভ্রমরের কি স্বামীর কার্য্যে এইরূপ ভাবা উচিত? তিনি কি না বুঝিয়া একটা বলিয়াছেন? তাহা কখনই হইতে পারেনা—তবে "আমি অকারণে কাঁদিতেছি।" ইহাই সে কান্নার কারণ, ইহাই সেই প্রবোধের অর্থ। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও সন্দেহ ভ্রমরের মনে উঠিতে পারেনা।

গোবিন্দলাল বন্দরখালি যাত্রা করিলেন। ভ্রমর ধরিল, সেও যাইবে। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিলেন না। তখন "ভ্রমর আগে মাটীতে পড়িয়া কাঁদিল। তার পর উঠিয়া, অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল ইত্যাদি।"

গোবিন্দলাল চলিয়া গেলে ভ্রমরের বড় কষ্ট হইল। "কিছু ভাল লাগেনা—ভ্রমর একা।" ভ্রমর খায় না, খেলা করেনা—খোঁপা বাঁধেনা * * *। *

"ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, 'ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর? যাঁর জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা এক দিনের জন্য ভাবেন? তুমি মর্‌তেছ কেঁদে কেটে—আর তিনি হয়ত হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন?' ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিল। ক্ষীরি থামিবার লোক নহে—আবার সে সেই কথা বলিল—একটি যুক্তিও তৎসঙ্গে দিতে ভুলিল না। "ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল; তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষ আপনি কাঁদিতে লাগিল।" শেষে যখন ক্ষীরি আবার পাঁচি চাঁড়াল্‌নীকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিল "ভ্রমর ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে

---

* আর উদ্ধৃত করিয়া উঠিতে পারিলা। পাঠকবর্গ এই সময়ে এই স্থানটুকু 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' ২০তি পরিচ্ছেদ হইতে একবার পড়িয়া লইলে ভাল হয়।

কাঁদিতে বলিতে লাগিল, 'তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয় তুই করগে—আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি, যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়াল্‌নীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্! ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।" ক্ষীরি চলিয়া গেল। "এদিকে ভ্রমর ঊর্দ্ধমুখে, সজলনয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার এক মাত্র সত্য স্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে!' তার মনের ভিতর যে মন, যে মন হৃদয়ের লুক্কায়িত স্থলে কেহ কখন দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিলেন, যে তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।"

এখন পর্য্যন্তও ভ্রমরের মনে অবিশ্বাস স্থান লাভ করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিয়াছিল, নতুবা ভ্রমর হৃদয় খুঁজিতে যাইবে কেন? কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কথাটা সে দিনকার ঘটনার সহিত এত খাপিল যে, তাহা অবিশ্বাস করিতে মাত্র ভ্রমরেরই আয়ত্ব ছিল। ভ্রমর স্বামীর নিন্দা সহ্য করিতে পারে না—তাই অত কাঁদিয়াছিল। স্বামীকে অবিশ্বাস করিয়া সে কান্না আসে নাই।

ক্রমে ঘটনা ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইল। গ্রামের মেয়েরা দল বাঁধিয়া আসিয়া ভ্রমরকে জানাইল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি আসক্ত। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ভ্রমরের হৃদয়ের বিশ্বাস-বারি স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছিল—অবিশ্বাসের ভাঁটা তখনও বহে নাই সত্য, কিন্তু জোয়ারেরও বেগ তখন বিদ্যমান ছিল না। এখন ভাঁটা আসিল। ভ্রমরের কপাল পুড়িল। তাহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইল। অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে চেষ্টা ফলবতী হইল না।

"ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল 'হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই

বলিতেছে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই; আজি আমার সন্দেহ ভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।"

গোবিন্দলালের জীবনের যে অধ্যায়ে আমরা রোহিণীর প্রতি তাঁহার আসক্তির সঞ্চার প্রকাশিত দেখিতে পাইলাম, ভ্রমরের জীবনের এই অধ্যায়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। গোবিন্দলাল তখন ঘটনা-চক্রে পড়িয়া কিছু বিচলিত হইয়া আত্মসংযমের চেষ্টা করিতেছিলেন,—এখন ভ্রমর ঘটনা-চক্রে পড়িয়া কিছু সন্দেহযুক্ত হইয়া সন্দেহ দূর করিতে,—স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস দূর করিতে, চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু গোবিন্দলাল ধীর পুরুষ, গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভাবিয়া ও অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া তাহাতে কিছু কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; ভ্রমর বালিকা, স্বামীময়জীবিতা, সংসারের কুটিলতা এখনও জানে না, শেখে নাই—ভ্রমর চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। গোবিন্দলালের ভুলিবার বিষয় রোহিণী—কিন্তু ভ্রমরের ভুলিবার বিষয় তাহার স্বামীর চরিত্র—তাই গোবিন্দলাল কৃতকার্য্য হইলেন—ভ্রমর পারিল না।

এমন সময়ে রোহিণী আসিয়া ভ্রমরের সম্মুখে এক পুঁটুলি গহনা লইয়া উপস্থিত হইল। "ভ্রমর বিস্মিত হইল—রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল, 'তুমি সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে; আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি'?" ভ্রমরের এই কথাটা এক দিকে তাহার যন্ত্রণারাশি যেমন দেখাইয়াছে, অন্যদিকে তাহার স্বভাবের আর একটি ভাবও বড় সুন্দর দেখাইয়াছে। ভ্রমর যে রাগিলে কতদূর মর্ম্মভেদী কথা বলিতে পারে, বলিয়া থাকে, তাহার পরিচয় আমরা এইখানে প্রথম পাইলাম।

রোহিণী-ভ্রমরের সব কথা এখানে বলিবার স্থান নাই। গ্রন্থকার এ সাক্ষাৎটি বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক করিয়া আঁকিয়াছেন।

যাহা হউক, যখন ভ্রমরের মনে গোবিন্দলালের দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাস অবিশ্বাসে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল, তখন আবার এইরূপ ঘটনা আসিয়া

ভ্রমরকে ব্যতিব্যস্ত করিল। ঢেউর পরে ঢেউ আসিতে লাগিল—সাধ্য কি বালিকা তাহাতে স্থির থাকিতে পারে? তাই রোহিণী, পাপিষ্ঠা দুশ্চারিণী রোহিণী, যখন আসিয়া ভ্রমরকে গহনা পত্র দেখাইয়া প্রতারণা করিয়া গেল, তাহার সরল মন অবিশ্বাসের ঢেউতে ভাসিয়া গেল। ভ্রমরের এ অবিশ্বাসটি যে অনুচিত হইয়াছিল, তাহা কে না বলিবে? কিন্তু ইহার জন্য তাহার উপর রাগ করিতে পারা যায় না—দুঃখই হয়। মানুষ এমনই ঘটনার দাস! এ ঘটনাচক্র হইতে উদ্ধার লাভ করিতে কি অল্প শক্তির আবশ্যক? অল্প স্থৈর্য্যের আবশ্যক? ভ্রমরের তাহা ছিলনা। ছিলনা কেন, তাহা পরে বলিব; এখন তাহার দোষটুকু বলিয়া রাখি।

অবিশ্বাসের সহিত অভিমান আসিয়া যোগ দিল। ভ্রমর দুঃখে, ক্রোধে, অবিশ্বাসে, অভিমানে, গোবিন্দলালের নিকট একখানি ভয়ানক পত্র লিখিলেন। পত্রখানি আমরা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।/ ভ্রমর লিখিল "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও, আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

আমরা পাঠকবর্গের সহিত ভ্রমরকে এখন বলিতে পারি 'ছি! ভ্রমর, এ তোমার উপযুক্ত কাজ হয় নাই। কাহাকে তুমি অমন করিয়া পত্র লিখিতেছ?' আরও কিছু এখানে বলিবার ছিল। ভ্রমর-চরিত্রের আর একটু রহস্য এইখানে ব্যাখ্যা করা যাইত—কিন্তু স্থানে স্থানে না করিয়া একস্থানে করাই ভাল মনে করিয়া অন্যত্রের জন্য তাহা রাখিয়া দিলাম।

গোবিন্দলাল পত্র পাইয়া গৃহে যাত্রা করিলেন—ভ্রমরও কথা মত কার্য্য করিল—চক্রান্ত করিয়া পিত্রালয়ে গেল।

ভ্রমরের জীবনের তৃতীয় অধ্যায় এইখানে শেষ হইল। ভ্রমর যত কিছু অপরাধ করিয়াছে, এই অধ্যায়েই তাহা করিয়াছে।

গোবিন্দলাল বাটী আসিয়া ভ্রমরকে আনাইলেন না। বাটী হইতে তাহাকে আনিবার জন্য উদ্যোগ হইতেছিল, গোবিন্দলাল তাহা নিষেধ করিলেন। ভ্রমরও আসিল না।

কিছুদিন পরে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হইল। এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে

আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরদিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণ-কান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল। গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠশ্বশুরের জন্য কাতর। গোবিন্দলালকে দেখিয়া ভ্রমর আরও কাঁদিতে লাগিল। শোকের রীতিই এই। "Grief in its freshness feels the need of associating its loss and its lament with every change of scene and incident"—Adam Bede. এ ত সাধারণ কথা। তার পর শোকের আরও এক ধর্ম্ম এই যে, প্রিয়জন দেখিলে তাহা যেন উছলিয়া উঠে। যেখানে সহানুভূতি বেশি, কাঁদা কাটাও সেই-খানে বেশি। ভ্রমরের এ কাঁদায় এ ভিন্ন অন্য কোন ভাব ছিল এরূপ বোধ হয় না। দিনের পরে দিন যাইতে লাগিল। গোবিন্দলাল একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন "ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। * * * শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।"

"ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, দুর্গা, শিব, হরি স্মরণ করিয়া বলিল, 'আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।'"

"আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল—দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল।" গোবিন্দলাল ও ভ্রমর উভয়েরই মনে যেন এক খানা খুব বড় মেঘে আঁধার করিয়া বসিল। "গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত, রোহিণী—ভ্রমর সে ঘোর, মহাঘোর অন্ধকারে, আলো করিবার জন্য ভাবিত, যম! নিরা-শ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম! চিত্ত-বিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম! আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা, তুমি যম! ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম!"

গ্রন্থকারের কি অপূর্ব্ব শক্তি—যেখানে যেভাবে যে ভাষায় তদীয় চরিত্র গুলির চিত্র সুন্দররূপে বিকশিত হইতে পারে, তিনি সেই খানে, সেই ভাবে, সেই ভাষাই অবতীর্ণ করিয়াছেন!

এই খানে ভ্রমর-জীবনের আর (৪র্থ) এক অধ্যায় কাটিয়া গেল। আমরা এই অধ্যায়-বিভাগগুলি মনোবৃত্তির স্থায়িত্ব অনুসারে করিতেছি।

যেখান হইতে নূতন কোন মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, আমরা সেইখানেই জীবনের একটি নূতন অঙ্ক প্রবর্ত্তন করিয়াছি।

ভ্রমর-জীবনের এ অঙ্কে দুইটি বৃত্তি সম্যক্ প্রবল দেখিতে পাই,—সন্দেহ জনিত ভয় বা ত্রাস ও দুঃখ। ভ্রমর যে ঐরূপ করিয়া পিত্রালয় যাইয়া কিছু অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল, তাহা রাগের প্রথম সময়টা অতিবাহিত হইলেই, সে বুঝিতে পারিল। বাটী বসিয়াই তাহার এ জন্য অনুতাপ হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রমর কিছু অভিমানিনী। সে চিরদিনই স্বামীর পরে জেদ করিয়া আসিয়াছে, এখনও তাহাই করিল। একবারও ভাবিল না যে, গোবিন্দলালের উপর এখন আর অভিমান ভাল খাটে না। তাই সে নিজে বাটী হইতে আসিল না। যখন বাটী হইতে আসিল, তখন যদি কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু না ঘটিত, আমরা কবির মুখে সে ভাবটি অবশ্যই অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত শুনিতে পাইতাম। যে দিন প্রথম গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের দেখা হয়, ভ্রমরের যেন বড় ভয়ানক বিপদ আসিয়া পড়িল। গোবিন্দলালকে সে কি বলিবে? তাই যখন সে দিন কোন কথাই হইলনা, ভ্রমর তাহার বাল্যপরিচিত "কালী, দুর্গা, শিব, হরি" স্মরণ করিতে লাগিল। বলিয়াছিত, কবির প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক বর্ণনায় যে কত ভাব, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আমরা মাত্র তাহার কয়েকটি দেখাইতে পারিয়াছি—সমস্তটা দেখাইতে গেলে, একখানি অতি বৃহদাকারের পুস্তক হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে ত্রাসের ভাবটাই প্রবল ছিল, শেষে দুঃখের ভাবটি প্রবল হইয়া পড়িল। আমাদিগের হৃদয়স্থ এই ভাব-বিবর্ত্তনগুলি বড়ই বিস্ময়কর ও জটিল। কিন্তু গ্রন্থকার তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ আমরা অনেক স্থলে পাইয়াছি, এখানেও পাইলাম। যাই ভয়—আর কিছু বলিতে পারিলাম না দেখিয়া ভয় বলিলায়—কাটিয়া গেল, দুঃখ আসিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল। এখানে দুঃখের স্ফুরণ নাই সত্য, কিন্তু তাহার ঘন প্রকৃতিটি বেশ দেখা যাইতেছে। সত্য সত্যই যেন সে আকাশে দুঃখের একখানি মেঘ উঠিল। মেঘ উঠিল বটে, হৃদয়খানি অন্ধকারও হইল বটে, কিন্তু সে মেঘে ইরম্মদ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কদাচিৎ যখন অন্য কোন ভাবের ও ঘটনার সংঘর্ষণ হইত, তখনই বিজলী চমকিত—তখনই আমরা শুনিতে পাইতাম, ভ্রমর বলিতেছে 'নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি যম! ইত্যাদি।'

ভ্রমরের এই দুঃখটি যে কিরূপ গম্ভীর ভাবে হৃদয় মধ্যে অবস্থিতি করিতে ছিল, তাহা পরিস্ফুট করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিনা। কোন প্রবল বাত্যাদির পূর্ব্বে সমুদ্রের জল যেরূপ শান্ত ও স্থির থাকে, ভ্রমরের এ দুঃখও বুঝি সেইরূপই ছিল। ভ্রমরের রোগ একদিনে হয়নাই।

কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। কৃষ্ণকান্ত মৃত্যুকালে যে উইল পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছিলেন, গোবিন্দলাল তাহা পড়িলেন। "পড়িয়া আসিয়া ভ্রমরকে বলিলেন 'উইলের কথা শুনিয়াছ?'

ভ্র। কি?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্র। আমার না তোমার?

গো। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। না। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, 'তবে কি করিবে?'

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

ভ্র। সে কি?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে?

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই?

গো। আজি কালি ওকথা সাজেনা ভ্রমর!

ভ্র। কি করিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানিনা। আটবৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানিনা, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুত্তুল—আমার কি অপরাধ হইল?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শতসহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানিনা, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিলনা। * * *

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষমা কর! আমি বালিকা!

যিনি অনন্ত সুখদুঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি একথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী প্রভাত শুক্র নক্ষত্ররূপিণী রূপতরঙ্গিনী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, 'কি বল?'

গোবিন্দলাল বলিল,

'আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।'

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। দ্বারদেশে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।"

ভ্রমরের জীবনের এ অঙ্কে দুইটি দৃশ্য আছে—তাহার প্রথমটি এই। আগে এতৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া লই।

ভ্রমর এখন গোবিন্দলালকে দেখিয়া পূর্ব্বের অভিমানটি পরিত্যাগ করিয়াছে। এ পরিত্যাগের দুইটি কারণ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একটি এই যে, গোবিন্দলালকে সে এজন্য কিয়ৎপরিমাণে কষ্ট দিয়াছে। সে যে বাড়ীতে না থাকায় গোবিন্দলালের কষ্ট হইয়া ছিল, তাহাতে তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাহার অভিমানের ফল ফলিয়াছিল। আমরা

এরূপ অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, আমরা একজনের উপর রাগ করিয়া যখন সেই রাগের কোন প্রতিবিধান করিতে পারি, অর্থাৎ যাহার উপর রাগ হয়, তাহাকে কোন প্রকারে দণ্ড দিতে পারি, তখন আমাদিগের একটু দুঃখও হয়। আমরা তাহার জন্য কষ্ট অনুভব করিতে থাকি—একটু অপরাধী থাকি। প্রণয়-পাত্র সম্বন্ধে এরূপটি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ভ্রমরের তাহাই ঘটিয়াছিল। এখন সে গোবিন্দলালের নিকট আপনাকে অপরাধী মনে করিত। তৎপ্রদত্ত শাস্তি, গোবিন্দলালের অপরাধকে ছাড়াইয়া যেন তাহার অপরাধ হইয়া পড়িল। তাই ভ্রমর বড় নরম হইল। আর একটি কারণ এই যে, প্রিয়বস্তুর উপর রাগাদি অদর্শনেই ঘটিয়া থাকে—সম্মুখে আসিলে, তাহা বড় থাকেনা। অনেককে বহির্বাটী হইতে স্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া, অন্তঃপুরে তাহার সম্মুখে হাসিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি। হাসিটা যাহাই হউক, সে ক্রোধভাবটা যে অনেক সময়ে থাকে না তাহা একরকম প্রত্যক্ষ স্বরূপ।

এই সমস্ত কারণে ভ্রমর এখন কাতর হইয়া স্বামীর নিকটে ক্ষমা চাহিতে লাগিল। এ কাতরতা বেশি ব্যাখ্যা করার আবশ্যক নাই। কিন্তু আর একটি কথা ব্যাখ্যা করিবার আছে। সেটি ভ্রমরের অহঙ্কার ও রাগ। যখন গোবিন্দলাল বলিলেন "তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না", ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, "কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সম্বরণ করিল। বলিল, 'তবে কি করিবে?'"। আবার গোবিন্দলাল যখন বলিলেন 'আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব', ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছিল, পদত্যাগ করিয়া উঠিল। উঠিয়া বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিল। এ সমস্ত অহঙ্কারের চিহ্ন। এরূপ চিহ্ন আমরা পূর্ব্বেও অল্প পরিমাণে লক্ষ্য করিয়াছি। এই অহঙ্কার, অভিমানই যে তাহার সর্ব্বনাশের উপায় হইয়া বসিল, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। এখন ইহার প্রকৃতি আমরা কিছু পর্য্যালোচনা করিতে চাহি। ইহা লইয়াই ভ্রমর।

প্রথমে দেখা যাউক, এ অহঙ্কারটি কিসের? অহঙ্কার থাকিলে অবশ্য তাহা একটা না একটা ভাব আশ্রয় করিয়া থাকিবে। কেহবা ধনের জন্য অহঙ্কারী, কেহবা বিদ্যার জন্য অহঙ্কারী, কেহবা ধার্ম্মিক ভাবিয়া অহঙ্কারী, ইত্যাদি, অহঙ্কারী মাত্রেই একটা না একটার জন্য অহঙ্কারী থাকে। কেহ বা অনেকটার জন্যও থাকে—ভ্রমরের তবে এ অহঙ্কারটি কিসের জন্য? এই

প্রশ্নের উত্তরেই ভ্রমর-চরিত্রের সমস্ত রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমরা ইহা বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব্। আমাদিগের যেন বোধ হয়, ভ্রমরের এ অহঙ্কারটা, তাহার পতিভক্তি—পতিপ্রেম ও ধর্ম্মানুরাগের জন্য—অথবা এক কথায় বলিতে গেলে, তাহার সমস্ত হৃদয়টুকুর জন্য। ভ্রমর যে পতির প্রতি কর্ত্তব্যে কোন দিনও ত্রুটি করে নাই, ভ্রমর যে তাহাকে প্রকৃত সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসিত, ভ্রমর যে গোবিন্দলালের শিক্ষায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়া একান্ত ধর্ম্মানুরাগিনী হইয়াছিল, এ সকলই ভ্রমর বুঝিত। বুঝিত, ও এসম্বন্ধে তাহার একটা অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। গোবিন্দলালের আদরে এ অহঙ্কারের পরিপুষ্টি। ভ্রমর যখন কালো বলিয়া আপনাকে গোবিন্দলালের আযোগ্যা ভাবিত; এ অহঙ্কারটি পুষ্ট হইয়া তাহাকে শান্তি প্রদান করিত। অহঙ্কারটা যেমন আত্মপ্রতারণা জন্মাইতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। ফলতঃ আত্মপ্রতারণা অনেক স্থলেই অহঙ্কারের স্থিরভাব।

এখন এই অহঙ্কারটুকুর কার্য্য তাহার প্রথম জীবনে বা জীবনের প্রথমাঙ্কগুলিতে কিরূপভাবে ছিল, দেখা যাউক। যেদিন ভ্রমর গোবিন্দ-লালের কথায় রোহিণীকে গোবিন্দলালের নিকটে একা রাখিয়া ছুটিয়া পলাইল, সে দিন ইহার ঈষৎ আভাস দেখিয়াছি। কিন্তু সে টুকু এত অল্প যে, আমরা তাহা সেখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি নাই। ভ্রমর যে গোবিন্দলালকে কত দূর বিশ্বাস করে তাহা দেখাইবার ইচ্ছাটাও যেন তাহাতে একটু ছিল। ইহা অহঙ্কারের চিহ্ন নয় কি? আর একদিন ভ্রমর কোপাবিষ্ট হইয়া গোবিন্দলালকে বলিতেছিল "সে কি? আমায় ভাব্‌ছনা আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?" একথায় যেন আর একভাবে অহঙ্কারের একটু অতি অল্প চিহ্ন দেখিতে পাই। গোবিন্দলাল যে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এতৎসম্বন্ধেও তাহার একটু অহঙ্কার ছিল। যেদিনই আমরা এই অভিমানের প্রতিরোধী ঘটনা দেখিয়াছি, সেইদিনই ভ্রমরকে তাপিত দেখিয়াছি। যে দিন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বারুণী-রোহিণী সংবাদ জিজ্ঞাসিত হইয়াও বলিলেন না, সে দিনও এঅভিমানে কিছু আঘাত পড়িয়াছিল। এই অহঙ্কারেই ভ্রমরকে গোবিন্দ- লালের নিকট ঐরূপ কঠোর পত্র লিখিতে প্ররোচনা জন্মাইয়া ছিল—এই অভিমানেই তাহাকে অসময়ে পিত্রালয়ে যাইতে পরামর্শ প্রদান করিল। পত্রখানির কথা আমরা পরে বলিব—পিত্রালয়ে যাওয়ার কথাটা বলা হইয়াছে।

ভ্রমর-চরিত্রের এ অহঙ্কারটুকুর ভালমন্দ সমালোচনা আমাদিগের মূলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে নহে। আমাদিগের উদ্দেশ্য কেবল সেইটুকু দেখাইয়া দেওয়া। কিন্তু যেরূপ গোবিন্দলালের চিত্রের উপসংহারে আমরা কয়েকটি নৈতিক তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি—ভ্রমরের চরিত্র শেষেও সেইরূপ করিতে ইচ্ছা রহিল। সুতরাং সে প্রশ্নটা, তখনকার জন্যই রাখিয়া দিলাম। একটি কথা কিন্তু না বলিলে বড় দুঃখ হয়। আমরা বিশ্লেষণ কার্য্যে নিযুক্ত আছি বলিয়াই, ভ্রমরের অহঙ্কার, অভিমান বা রাগটুকু অত বিস্তৃত করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু তাহাতে আমাদিগের বড় কষ্ট হইয়াছে। ভ্রমরের অহঙ্কার, অভিমান, যাহাই থাকুক না কেন, যখন সে বলিল 'আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানিনা, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।' তখন আমাদিগের সব কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। ধর্ম্মানুরাগটি বাদ দিলে, এই কথাই বাস্তবিক ভ্রমরের রাগের একমাত্র কারণ বটে। বলিয়াছিই ত ভ্রমরের হৃদয়ে মাত্র দুইটি ভাব প্রজ্বলিত—পতিভক্তি, পতিপ্রেম—ধর্ম্মানুরাগ—পাপে অনাসক্তি বা ঘৃণা।

গোবিন্দলালের মাতা এখন কাশী যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভ্রমরের উপর তাঁহার কিছু রাগও হইয়াছিল—ভ্রমর বিষয়াধিকারিণী হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর অতি সাধারণ চরিত্রেও একটু না একটু সেই সর্ব্বদর্শী প্রতিভা প্রতিভাত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করিয়াছি এক লাইন হউক, দুই লাইন হউক, প্রত্যেক চিত্র সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিব। যদি দুই একটি কথার মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই, তাহা ব্যাখ্যা করিলে উপকার হইতে পারে, এরূপ বোধ করি, তাহা কেনই বা না করিব? কেবল প্রধান চরিত্র লইয়াই তিনি পাঠকের মনোরঞ্জন ও স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন, এমত নহে; তাঁহার প্রত্যেক চরিত্রেই কিছু না কিছু বলিবার আছে। আমাদের বড় দুঃখ হয় যে, আমরা শব্দশাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞ নহি—তাহা হইলে, পাঠকগণের নিকট এই সকল সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কিছু তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম।

"ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন। ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, 'কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও'। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'বলিতে

পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।' ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মনে ভাবিল 'ভয় কি? বিষ খা[illegible]

তারপরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসি[illegible] [illegible]স্থিত হ[illegible]ল। "গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া [illegible] [illegible]গৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদন-বিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে না পারিয়া, কেবল বলিলেন 'ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম'। ভ্রমর, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, 'মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?' কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাঁহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাঁহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, 'দেখ তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য-বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে? গোবিন্দলাল বলিলেন, 'তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।'

ভ্র। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকেনা।

ভ্র। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না?

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্র। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

* * * *

গো।—আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা,—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী— আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—ভ্রমর যোড়হাত করিয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল 'তবে যাও—পার, আসিওনা। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব ভ্রমর কোথায়? দেবতা সাক্ষী, যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।' এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া, গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।"

ভ্রমরের শেষ আশা ফুরাইল। তাহার জীবনের দুঃখের অঙ্কগুলি, একটি আর একটি প্রবলতর অঙ্ককে স্থান দান করিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল।

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি আমরা যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছি। দ্বিতীয় দৃশ্যে যাহা বলিবার আছে, তাহা এখন বলিব।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে আসিবার পূর্ব্বেই ভ্রমর সে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সে বিদায়ের জ্বালা ভ্রমর পূর্ব্বেই কল্পনায় ভোগ করিয়াছিল,তাই গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাতে

তাহার কোন নূতন বিকাশ দেখিতে পাইলাম না। ভ্রমর ভবিষ্যৎটি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল। গোবিন্দলালের বিদায় গ্রহণ কালে সে কি কথা বলিবে, তাহাও সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল—তাই তাহার সে সময়কার স্বর অত স্থির ও গম্ভীর দেখিতে পাইলাম। 'ভয় কি, বিষ খাইব' এই রকমেরই একটা কথা তাহার মনে উঠিতেছিল, তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিতে পাইলেন।

ভ্রমরের মনে মনে একটা বড় সাহস ছিল—সে নিরপরাধী। গোবিন্দলাল তাহার প্রতি অযথারূপে অন্যায়াচরণ করিতেছেন। এই সাহস—অথবা অভিমান তাহাকে অনেক সময়ে প্রশান্ত ও গম্ভীর করিয়া তুলিত। ভ্রমরের হৃদয় এখন আবেগপূর্ণ—তাহার ভাষা এখন জ্বলন্ত। সে পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া একবার ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দেখিল। বলিল "দেখ তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিওনা।" শিষ্য এখন গুরুকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সত্য কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে 'সত্য বলিও'। গোবিন্দলাল যে ভ্রমরকে কিরূপ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন, এই দৃশ্য দুইটিতে তাহা বড় খুলিয়াছে। ভ্রমর যেমন স্বামিভক্ত তেমনি সত্যানুরাগী—কারণ স্বামী তাহাকে বলিয়াছে যে 'সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম—সত্যই একমাত্র সুখ'। ভ্রমরের ধর্ম্মানুরাগেও স্বামিভক্তি ও তাঁহার মহত্ত্বে বিশ্বাস, কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে! ভ্রমরের মত পতিব্রতা কে?

ভ্রমর স্বামীর হাত পায়ে ধরিয়াও যখন ক্ষমা পাইল না, ভ্রমর আবার ধর্ম্মের কথা পাড়িল—জিজ্ঞাসিল, ধর্ম্মানুরাগী, ধার্ম্মিক স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ধর্ম্ম নাই কি?' গোবিন্দলাল বলিলেন, 'বুঝি আমার তাও নাই।'

'বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল।' এ চক্ষের জল আসাও যেমন সুন্দর, তাহা রোধ করাও তেমনি সুন্দর হইয়াছে। কবি যে কত দূর সূক্ষ্মদর্শী, তাহা এই সকল ক্ষুদ্র কথাতেও বেশ ব্যক্ত হয়। যিনি ভ্রমরকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, ধর্ম্মই জীবনের প্রধান সুখ, যিনি ভ্রমরের নিকট চিরদিনই ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যস্বরূপ বলিয়া হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত, যাঁহাকে ধার্ম্মিক ভাবিতে ভ্রমরের এত সুখ হইত যে বুঝি তাহাই তাহার জীবনের প্রধান সুখ ছিল, যাঁহার কলঙ্ক কথা শুনিলে ভ্রমর বৃশ্চিকদংশনেরও অধিক

যন্ত্রণা ভোগ করিত,সেই গোবিন্দলাল কি না বলিতেছে, 'বুঝি আমার স্মৃও নাই'! ভ্রমরের তখন অন্তর্দাহ হইতেছিল—মনোবৃত্তিগুলি যেন কেহ নিদারুণ নিষ্পেষিত করিতেছিল,কিন্তু তথাপি ভ্রমর রোদন করিল না—'হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল'। বলিয়াছি ত ভ্রমরের বড় অভিমান হইতেছিল—সেই অভিমানই তাহাকে প্রশান্ত ও স্থির করিয়া রাখিল। এবারে এ অভিমানের বহির্বিকাশ আমরা দেখিতে পাইলাম। ভ্রমর যোড় হস্ত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল 'তবে যাও * * *'। এ অভিমানটি ভালবাসার, এ অভিমানটি নিরপরাধী হইয়া অত্যাচারিত হইবার,এ অভিমানটি অভিমান দ্বারা চিত্ত জয় করিবার। এই অভিমানে আমাদিগের মনে আমাদিগেরই মহত্ত্ব উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিয়া দেয়,এই অভিমানেই আমাদিগকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষায় শ্রেষ্ঠতম ভাবের কথা বলিতে শিক্ষা দেয়। ভ্রমর এখন এই অভিমানে পূর্ণ হইয়া, তাহার হৃদয়স্থ স্বামিভক্তিটুকু পূর্ণমাত্রায় পড়িতে পাইয়া, ধর্ম্মের উপর অন্য সময়াপেক্ষা প্রবলতররূপে বিশ্বাসবতী হইয়া বলিতেছে—অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতেছে 'তবে যাও—পার, আসিওনা। ইত্যাদি * * *।" ভ্রমরের এ জ্বলন্ত ভাষার প্রত্যেক স্থলে তাহার সেই ভাবটি সুব্যক্ত হইয়া ফুটিয়া পড়িয়াছে। ইহা কি বুঝান যায়?

ভ্রমরের এই সকল জোরের কথায়, ভ্রমরের সেইরূপ করিয়া 'গজেন্দ্রগমনে' কক্ষান্তরে যাওয়ায় যে ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা কবি ভিন্ন অন্যে বুঝাইতে পারে না। আমরা কিরূপে বুঝাইব?

ভ্রমরের জীবনের পঞ্চমাঙ্ক এইরূপে অভিনীত হইল। ভ্রমরের সব আশা ফুরাইল। অভিমান আর ভ্রমরকে স্থির রাখিতে পারিল না। গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে অভিমানও নিস্তেজ হইল, বুঝি কিছুদিনের জন্য নিবিয়াই বা গেল। তাই ভ্রমর এখন সাতদিনের একটি ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। "মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। 'আমার ননীর পুতলী, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা,তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর?—* *'। ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে উর্দ্ধমুখে, অথচ অস্ফুটবাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—'কেহ আমাকে

বলিয়া দাও—আমার কি দোষে, এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল; আমার পুত্র মরিয়াছে—আমায় স্বামী ত্যাগ করিল—আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স! আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—আমি আজ, এই সতের বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন?' ভ্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল—দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর তখন মনুষ্য আর কি করিবে —কেবল কাঁদিবে? ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।"

আমরাও অনেকবার আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে ভ্রমরের কি অপরাধ যে তাহার ভাগ্যে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইল? মানব-জীবনে এরূপ চিন্তা অনেকেরই করিতে হয়।

ইহার মধ্যে ব্যাখ্যা করিবার আর একটি কথা আছে। সেটি আমরা বৃহদাক্ষরে মুদ্রিত করাইয়া লইয়াছি। ভ্রমর যে বালিকা হইয়াও, সংসার-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞা হইয়াও, ভালবাসার কথা কিরূপ বুঝিত, তাহা এই কথাটিতে বেশ প্রমাণিত হয়। গোবিন্দলালের রোহিণী-আসক্তি যে শুদ্ধ রূপের জন্য, তাহা ভ্রমর বেশ বুঝিয়া ছিল। ফলতঃ পক্ষে আমরা ভ্রমরকে রাগের সময় ব্যতীত অন্যত্র বিলক্ষণ বুদ্ধিমতীই দেখিতে পাই।

এইরূপে কাঁদিয়া কাটিয়া ভ্রমরের শোকবেগ কিছু প্রশমিত হইল, অথবা শোকের অনতিকালস্থায়ী অবিচ্ছেদী ঘনভাব, স্থায়ী, দৃঢ়, কিন্তু অসংযুক্ত ভাব ধারণ করিল। শোকচিহ্ন একেবারে মুছিবার নহে—"ক্ষত ভাল হয়, কিন্তু দাগ ভাল হয় না।"

ভ্রমর সম্বাদ পাইল, গোবিন্দলাল মাতা প্রভৃতি সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। এ সংবাদ কিন্তু গোবিন্দলাল ভ্রমরকে দেন নাই। অভিমানিনী ভ্রমরও স্বামীকে কোন পত্র লিখিল না। কিছু দিন পরে পত্র আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদর্শী ভ্রমর বুঝিল যে, উহা কেবল ফাঁকি। গোবিন্দলাল যে বাটী আসিবেন, তাহা তাহার বিশ্বাস হইল না। ভ্রমর এখন রোহিণীর সম্বাদ লইতে লাগিল। "এদিকে ৩।৪ মাস গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। ৫মাস ৬মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিত, এখন কোথায় আছেন, কেমন

আছেন—সম্বাদ পাইলেই বাঁচি। এ সম্বাদও পাইনা কেন ?” তাই ত, অভিমানে কি স্নেহ, ভালবাসা, প্রণয়, ভক্তি একেবারে চাপিয়া রাখিতে পারে ? ভ্রমর অভিমানভরে চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিলেও, হৃদয়ের রোদন বুঝি কখনও নিবারণ করিতে পারে নাই। পারিবে কেন ? কোন্ পতিব্রতা, আর্য্যরমণী হইয়া, স্বামীর প্রকৃত অপরাধ সত্বেও, রাগ করিয়া তৎপ্রতি স্নেহ, ভালবাসা ভুলিয়া যাইতে পারে ? সে যে রাগ করে, তাহা স্বামীর ভালর জন্য—তাহার রাগের জন্য নহে। যেখানে প্রকৃত স্নেহ,সেখানে শত অপরাধ, শত কলঙ্কও দাঁড়াইতে পারে না। কোন্ মাতা অপরাধী পুত্রকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন ? পিতাও তাহা পারেন না।

শেষে রোহিণীও অনুদ্দেশ হইল। ভ্রমর সব বুঝিল। ভ্রমর ভাবিতে লাগিল “ভগবান জানেন রোহিণী কোথায় গেল ? আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না।” সর্ব্বত্রই ভ্রমরের চরিত্রটি বড়ই উজ্জ্বল ও জীবন্ত হইয়াছে।

ভ্রমর কাঁদিতে২ বাড়ী গেল। সেখানে গোবিন্দলালের কোন সম্বাদ পাওয়া দুরূহ ভাবিয়া বাড়ী হইতে আবার হরিদ্রগ্রামে আসিল। শ্বাশুড়ীর নিকট পত্র লিখিল। তিনি গোবিন্দলালের কোন সম্বাদ লিখিতে পারিলেন না। ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিল। ‘অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।’

ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। কন্যার দশা দেখিয়া অনেক রোদন করিলেন। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষ ভ্রমর বলিল ‘বাবা, আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করাও। আমি ছেলে মানুষ হলে কি হয় ? আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন ? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এসকল করাইবে ? বাবা তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।” ভ্রমরের কথাগুলি শুনিলে কোন্ পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত না হয় ? গোবিন্দলালের পাপ অল্প নহে। ভ্রমর এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে,এ শরীর আর সারিবেনা। গোবিন্দলালের সহিত তাহার এভাবে মৃত্যু নিশ্চিত। ভ্রমর কি এখন বাঁচিতে পারে ?

মাধবীনাথ ইহার পরে যাহা যাহা করিলেন, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গোবিন্দলালের ভ্রমর—পরিত্যাগের তৃতীয় বৎসরে ভ্রমর সম্বাদ পাইলেন,

গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিয়াছেন। ভ্রমরের জীবনের আর একটী অঙ্ক গড়াইয়া পড়িল।

ইহা শুনিয়া যামিনী বলিতেছিল যে গোবিন্দলালের এখন নিজ বাড়ীতে আসা কর্ত্তব্য। টাকা হাতে থাকিলে পুলিস বশ করিয়া মোকর্দ্দমার সুবিধা হইতে পারে। ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল। কে এখন গোবিন্দলালকে সন্ধান করিয়া সে পরামর্শ দেয়? যামিনী বলিল যে এক্ষণ তিনি হলুদগাঁয়ে আপনা হইতেই আসিবেন, এরূপ আশা করা যায়। ভ্রমর বলিল তাহার কোন ভরসা নাই।

যা। যদিই আসেন।

ভ্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদে থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায় ভগিনি! তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কি জানি তিনি কোন দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন? যদি আমলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ না করেন? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ভ্র। আমার এই রোগ। কবে মরি কবে বাঁচি—আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব?

যা। বল যদি না হয় আমরা কেহ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, 'আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবেনা। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।'

যা। কি বিপদ্ ভ্রমর?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'যদি তিনি আসেন!'

যা। সে আবার বিপদ্ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে তাহার চেয়ে—আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

ভ্র। আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে?

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না ভ্রমর মানস চক্ষে, ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।"

এইখানে আমরা ভ্রমর-চরিত্রের রহস্যটি অপেক্ষাকৃত বিশদ দেখিতে পাইলাম। দেখিতে পাইলাম, ভ্রমর গোবিন্দলালকে যেরূপ ভালবাসিত, সে ভালবাসার প্রকৃতি কিরূপ ?— দেখিতে পাইলাম, ভ্রমর এখন গোবিন্দলালকে যেরূপ ভালবাসিতেছে, তাহারই বা প্রকৃতি কিরূপ ?—বলিয়াছি ত ভ্রমর যেরূপ স্বামি-পরায়ণা ছিল, ধর্ম্মেও তাহার সেইরূপ অনুরাগ ছিল— তাহার স্বামি-প্রেম, অর্দ্ধেক ভক্তি অর্দ্ধেক ভালবাসা, অর্দ্ধেক প্রণয় অর্দ্ধেক বিশ্বাস, অর্দ্ধেক নির্ভর করিত গোবিন্দলালের উপরে, অর্দ্ধেক নির্ভর করিত ভ্রমরের উপরে ; অর্দ্ধেক স্থায়ী, তাহা ভ্রমরের পরিবর্ত্তন না হইলে কোন মতেই বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইতে পারে না, অর্দ্ধেক অস্থায়ী তাহা গোবিন্দলালের চরিত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ভ্রমরের প্রণয় এখন পরিবর্ত্তিত হইল—অথবা পরিবর্ত্তিত হইল বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিল।

গোবিন্দলালের প্রতি তাহার যে স্নেহ বা ভালবাসা ছিল, তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু যে ভক্তি বিশ্বাসটুকু ছিল, তাহা লুপ্তপ্রায় হইল। স্বামীর প্রতি যেরূপ প্রণয় স্ত্রীলোকের থাকা কর্ত্তব্য,ভ্রমরের এখন তাহা রহিল না। এখন যাহা রহিল, তাহার অর্দ্ধেক ভাগ বিপন্ন প্রতি দয়া বা সমবেদনা, অর্দ্ধেক ভাগ প্রকৃত স্ত্রীর স্নেহ বা ভালবাসা। ইহার মধ্যে গোবিন্দলালের পূর্ব্বচরিত্র স্মৃতি জনিত ভক্তির কণিকাও থাকিতে পারে—থাকিতে পারে কেন, তাহা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু ভ্রমর তাহা গ্রাহ্য করিতে চাহিত না। তাহার নৈতিক উন্নত চরিত্র যেন সেটুকু স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত। যাহা হউক, যেরূপেই হউক, গোবিন্দলালের প্রতি তাহার স্নেহাংশ এখন বৃদ্ধিই পাইল। কারণ গোবিন্দলাল এখন বিপন্ন —গোবিন্দলাল এখন পাপের শাস্তি ভোগে আরম্ভ করিয়াছেন।

"ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল— স্বামী ত আসিল না। কোন সম্বাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎ-

সরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। তার পর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসিল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানী কাশী রোগ—নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর —বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।"

তার পর পঞ্চম বৎসরে জনরবে সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছেন। ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইল। পিতা আসিলে তাঁহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিল "বাবা এখন যা করিতে হয় কর।—দেখিও— আমি আত্মহত্যা না করি।"

ভ্রমর এখন স্বামীর জন্য কাতর হইয়া পড়িল। অভিমান দূরে গেল, অহঙ্কার দূরে গেল,—স্বামী বিপদ্‌গ্রস্ত, এখন কি আর পতিব্রতা রমণী তাহা হৃদয়ে স্থান দিতে পারে?

মাধবীনাথ গোবিন্দলালকে খালাস করিয়া আনিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল বাড়ী ফিরিলেন না। কোথায় গেলেন, সন্ধানও পাওয়া গেল না। ভ্রমর এ সম্বাদ পাইয়া অনেক কাঁদিল। একি সেই গোবিন্দলাল? পূর্ব্বকথা সকল মনে হইল—গোবিন্দলালের যন্ত্রণার কথা মনে হইল, ভ্রমর মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বুঝি বলিতে লাগিল "হায় কার এমন থাকে, কার এমন যায়?"—বুঝি ভাবিতে লাগিল "এখনও কি তাঁহার ভ্রমরকে একবার দেখিতে সাধ হইল না? ভ্রমর ত আর বাঁচিবে না?"

অনেক দিন পরে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে এক পত্র লিখিলেন। যথা কালে তাহা ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল।

"পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সে দিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল তাহাদিগকে বলিল, আমার জ্বর হইয়াছে —আহার করিব না। ভ্রমরের সর্ব্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।"

কিসের অভিমান ভ্রমর? তুমি আর্য্যরমণী, আর্য্যরমণীই থাক, তাহাই আমরা দেখিতে অভ্যস্ত, তাহাই আমরা দেখিতে ভালবাসি। স্বামী ছাড়া তোমার আবার অন্য ধর্ম্ম ভাবিবার আবশ্যক কি? স্বামীকে ভালবাসিবে,

স্বামীকে ভক্তি করিবে, তোমারই জন্য; স্বামীর জন্য কি আর্য্যরমণী তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকে? তোমার হৃদয়টুকু আর্য্যরমণীরই বটে, এ কোমলতা, এ স্নেহ, অন্য কোন স্থানের নহে; কিন্তু তোমার শিক্ষাটি পাশ্চাত্য শিক্ষা। শিক্ষা যে তোমার মন্দ ছিল, তাহা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা তোমার চরিত্রে খাপিল না। হ্যাঁ, তোমার নৈতিক উন্নতি বজায় রাখিয়া যদি তুমি তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারিতে—যেমন গোবিন্দলাল তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার এ শিক্ষার ফলে, এ অভিমানের বলে, তুমি চিরদিনই উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম থাকিতে পারিতে। আর্য্যরমণী তাহা কি পারে? কার্য্যে পারিলেও, হৃদয়ে পারে না—মুখে পারিলেও, মনে পারে না। বুঝিয়াছি, এ শিক্ষা তোমাকে গোবিন্দলাল দিয়াছিলেন—গোবিন্দলাল দিয়াছিলেন বলিয়াই তুমি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে, কিন্তু গোবিন্দলালের এটিতে একটি ভ্রম জন্মিয়াছিল। তিনি শিক্ষিত, ধার্ম্মিক, সহৃদয় যাহাই থাকুন না কেন, তিনি এটি বুঝিতে পারেন নাই যে এটি আমাদের দেশে খাটে না। ভ্রমর-চরিত্র অঙ্কন করিবার কি উদ্দেশ্য ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা অতি ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন হইলেও, এই-খানে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এতদ্ভিন্ন যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা সিদ্ধ হয় নাই। ভ্রমরকে যদি আদর্শ রমণী করিয়া তিনি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহা সফল হয় নাই। অন্য কতকগুলি পরিবর্ত্তন না ঘটিলে, এদেশে ভ্রমর আদর্শ-রমণী হইতে পারে না।

"পরদিন নিদ্রাশূন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিত্ত স্থির —বিকারশূন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্রবার ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

'সেবিকা' পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য অতএব লিখিলেন, 'প্রণামা শত সহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ'।" পত্র খানি আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এখন আমরা পত্রের এই পাঠ সম্বন্ধে ও আরও দুই একটি কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। \

ভ্রমর এবার 'সেবিকা' পাঠ লিখিল না। ধর্ম্মাভিমানিনী ভ্রমর এবার

স্বামীকে একটু নীচ চক্ষে দেখিল। এই পাঠেই আমরা ভ্রমর-চরিত্রের রহস্য বিকশিত দেখিতে পাই। এই পাঠ পড়িয়াই আমরা বুঝিতে পারি যে ভ্রমরের প্রথম পত্র "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য—ইত্যাদি' কতদূর সত্য। ভ্রমরের অভিমান শুদ্ধ প্রণয়ের নহে—ধর্ম্মেরও, নির্দ্দোষ চরিত্রেরও। এ অভিমানটুকু সম্পূর্ণ গোবিন্দলালের শিক্ষার ফল। সে শিক্ষার বিষয়ে কবি আমাদিগকে কিছুই বলেন নাই সত্য, কিন্তু স্থানে স্থানে তাহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে। এই অভিমানে ভ্রমরকে বড় "রূঢ়বাদী" করিয়া তুলিয়াছিল। ভ্রমর এই অভিমানে দর্পিত হইলে,অতি সুতীক্ষ্ন মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিত। পূর্ব্ব পত্রে সে লিখিয়াছিল "এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও, আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।" এবার লিখিল "আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহায় আমার সন্দেহ নাই।" অন্যত্র "আরও অধিক (টাকা) পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা।"

এ কথাগুলি যে হৃদয়ে কতদূর লাগে, তাহা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। পত্রখানি পড়িয়া গোবিন্দলাল মনে করিয়াছিলেন "এতটুকু কোমলতাও নাই! গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন ছয় বৎসরের পরে লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর!"

বড়ই দুঃখের বিষয় গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভাল করিয়া চিনিয়াও সময়ে সময়ে তাহা ভুলিয়া যাইতেন। ভ্রমরের এ সব যে ক্ষণিক উত্তেজনার ফল, অভিমানের পরিণাম, তাহা তিনি অনেক সময়েই বুঝিতে পারিতেন না। ভ্রমরের ইচ্ছা গোবিন্দলালকে শাস্তি প্রদান করিয়া সৎপথে আনা। গোবিন্দলাল যে এইরূপ পত্রে ব্যথিত হইবেন, তাহা সে বেশ জানিত, জানিত বলিয়াই এইরূপ লিখিয়াছিল। ভ্রমরের ঐ ত দোষ—রাগ হইলে তাহার আর জ্ঞান থাকিত না। অভিমানের মোহে তাহার তীক্ষ্নদৃষ্টি লুপ্ত হইত। ভ্রমর বুঝিত না যে এখন কোমলতাই দেখান ভাল—তাহাতেও গোবিন্দলালের শাস্তি হইবে, কিন্তু অন্য ফল বেশি হইবে। মিঠে কথায় অসাধুচরিত্রকেও সাধু করা যায়—রাগ করিলে সাধুচরিত্রও বিকৃত হইতে পারে।

ভ্রমরের পীড়া বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। বৃদ্ধি হইবারই কথা।

"রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষমাস এইরূপে গেল। মাঘমাসে ভ্রমর ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। ঔষধ সেবন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন 'আর ঔষধ খাওয়া হইবে না দিদি —সম্মুখে ফাগুনমাস—ফাগুনমাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্রি পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে, পূর্ণিমার রাত্রি পার হই—তবে আমায় একটা অন্তরটিপনি দিতে ভুলিস্ না। রোগে হউক, অন্তরটিপনীতে হউক—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।"

ভ্রমর-জীবনের দুঃখের অঙ্ক এইখানে ফুরাইল। ভ্রমরের মন এখন অপার্থিব ভাবে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অভিমান দূরে গেল—পবিত্রতায় হৃদয় ভরিয়া গেল। ভ্রমর এখন স্বর্গারোহণের উপযুক্ত হইতে ছিল। এখন যে অঙ্কটি আসিবে তাহা তাহার স্বর্গারোহণের উপক্রমণিকা পর্ব্বাধ্যায়। সুখের আরম্ভ।

"যামিনী কাঁদিল, কিন্তু ভ্রমর আর ঔষধ খাইল না। ঔষধ খায় না, রোগের শান্তি নাই—কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্লচিত্ত হইতে লাগিল। এতদিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল—ছয় বৎসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল। যত দিন যাইতে লাগিল—অন্তিম কাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল—ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্ত্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য, এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণায়ও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন, 'আজ শেষ দিন।' যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল, 'দিদি—আজ শেষ দিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।' যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না। ভ্রমর বলিল, 'আমার এক ভিক্ষা ;—আজ কাঁদিও না।—আমি মরিলে পর কাঁদিও —আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কইতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।' যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল—কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না। ভ্রমর বলিতে লাগিল—'আর একটি ভিক্ষা —তুমি

ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পার না।' যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে? ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন. 'দিদি রাত্র কি জ্যোৎস্না?' যামিনী, জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, 'দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।' ভ্র। 'তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি এই জানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?' সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজ সাত বৎসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেলা খোলেন নাই। যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া, বলিল, 'কই এখানে ত ফুল-বাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।' ভ্রমর বলিল, 'সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বেমেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।' অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তার পর ভ্রমর বলি-লেন, 'যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না আজ আমার ফুলশয্যা?' যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল, 'ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও—আজ আমার ফুলশয্যা।' যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, 'কাঁদিতেছ কেন দিদি?' ভ্রমর বলিল, 'দিদি একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, একদিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিনে—মরিবার দিনে দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম! একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!' যামিনী বলিল, 'দেখিবে?' ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—বলিল—'কার কথা বলিতেছ?' যামিনী স্থিরভাবে বলিল, 'গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সম্বাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখি-বার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌঁছিয়াছেন।—তোমার অবস্থা দেখিয়া

ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।' ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, 'একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা!' যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুজনেই কাঁদিতে ছিল। একজনও কথা কহিতে পারিল না। ভ্রমর স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল—গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া, পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল 'আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।'

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।"

আমরা এখন কি করিব? সমালোচকের কঠোর হস্ত স্পর্শে কি এ কোমলতা নষ্ট করিব?—যাহার হৃদয় আছে, সে ইহা পারিবে না। তবে এতটা উদ্ধৃত করিয়া স্থান নষ্ট করিলাম কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে।—ভ্রমরের নিকট আমরা নানা কারণে অপরাধী হইয়াছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমরা ইহা করিলাম। যে ভ্রমরকে আমরা এইরূপ বলিয়াছি, সেই ভ্রমরকে আবার এইরূপ দেখাইলেই আমাদিগের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যদি কোথাও শত সহস্র গালি দিয়া থাকি, এ কার্য্যে তাহা পরিশোধ হইবে। তাই আমরা সজলনয়নে, কম্পিত-হৃদয়ে, দুঃখের সুখে এই স্থানটি সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। ইহাতে ব্যাখ্যার অনেক জিনিস আছে, কিন্তু সে ব্যাখ্যার ভাষা নাই। অথবা সে হৃদয়ের ভাষা আমাদিগের আয়ত্ত নহে। ভ্রমরের সেই মৃত্যুর পূর্ব্বের প্রফুল্লভাবে, সেই রূপ কথোপকথনে, সেই রূপ করিয়া জানেলা খুলিয়া জ্যোৎস্না দর্শনে, সেই ফুলবাগানের কথায়, সেই ফুলবাগানের কথা ভাবিয়া নীরব থাকায়, সেই রূপ করিয়া ফুল ছড়ানে, সেইরূপ করিয়া তখন গোবিন্দলালের জন্য ক্রন্দনে—সুখের শেষ উপাদান, এবং যাহাতে

সুখের স্ফূর্ত্তি সেই গোবিন্দলালের কথা মনে করায়, সেই রূপ করিয়া পতি সম্ভাষণ করায়, সেইরূপ করিয়া মৃত্যুতে, ভ্রমরকে যাহা বলিতেছে; বিজ্ঞ, বিজ্ঞতম, প্রবীণ, সমালোচকের কটু, কটুতর, কটুতম ভাষায়ও তাহার বিপরীত বলিয়া কোন ধারণা জন্মাইতে পারিবে না।

ভ্রমরের শেষ অঙ্ক সুখে অতিবাহিত হইল। ভ্রমরের জীবনের এই অঙ্ক বুঝি প্রথমাঙ্কের সহিতও তুলনীয় নহে। সত্য সত্যই ভ্রমর 'একদিনে, সাত বৎসরের দুঃখ' ভুলিতে পারিয়াছিল। এখন তাঁহার মত সুখী কে?

ভ্রমরের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদিগের এখন কিছু বলিবার আছে। এ চরিত্রটি একটু জটিল—যদিও প্রথম দৃষ্টিতে বেশ পরিস্কার বলিয়া বোধ হয়, ইহার অভ্যন্তরে অনেক রহস্য রহিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, গ্রন্থকার কি উদ্দেশ্যে এই চিত্রটির অবতারণা করিয়াছেন? ভ্রমর-চিত্র গোবিন্দলালের চিত্র স্ফুটন জন্য, না, গোবিন্দলালের চরিত্র ভ্রমর-চরিত্র স্ফুটন জন্য? ভ্রমর আদর্শ-রমণী চরিত্র, না, ভ্রমরে স্ত্রীজাতিসুলভ কোনও দুর্ব্বলতা দেখান হইয়াছে? এক কথায়, ভ্রমরের যে অভিমানটুকু ছিল, তাহা কি ভাল, থাকা উচিত, না, তাহা ভাল নহে, থাকা উচিত নহে?

ভ্রমর সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা যে সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে এরূপ ভরসা নাই। তবে আমরা যাহা বুঝি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ভ্রমর আর্য্যরমণী—তাহার হৃদয়খানি সাবিত্রীর উপকরণে গঠিত। কিন্তু তাহাতে একটু পাশ্চাত্য শিক্ষা যুক্ত হইয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামীকে সকল অবস্থাতেই ভক্তি করা আমাদিগের আর্য্য-শাস্ত্র সম্মত। ভ্রমর তাহা বুঝিত না। সে জানিত যে সে স্বামীকে ভক্তি করিত, স্বামীর গুণ দেখিয়া, নিজের গুণের জন্য নহে। তাহার নিকট স্বামী অপেক্ষাও বড় একটা পদার্থ ছিল—সেটি ধর্ম্ম। সে স্বামী অপেক্ষাও তাঁহার সুনামকে বেশি ভালবাসিত—তাহার ভালবাসা ব্যক্তিগত নহে, গুণগত। ইহা যে ভাল নহে, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ভ্রমরের হৃদয়ের সহিত এইটি ভাল খাপিল না। অন্য সব বিষয়ে আদর্শ আর্য্য রমণী হইয়াও এইটিতে ভ্রমর কিছু গোল করিয়াছিল। ভ্রমর যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহার আদর্শ আর্য্য রমণীত্ব বজায় রাখিতে হইলে, স্বামীর নিকট তাহাকে সর্ব্বদা রোরুদ্যমানা ও বিনতাই দেখিতাম—স্বামীকে কর্কশ ও ও অপ্রিয় বাক্য দ্বারা সন্তাড়ন করিতে দেখিতাম না। এই দোষটি যে এতদ্দেশে নাই

তাহা আমরা বলিতেছি না—এদেশেও এইরূপ অভিমানিনী স্ত্রী বিরল নহে। তবে ওরূপ ধর্ম্মের অভিমান, হত্যাকারী বলিয়া স্বামীর প্রতি ভক্তির খর্ব্বতা, এদেশে আগে দেখাই যাইত না—এখনও বড় একটা দেখা যায় না। ভ্রমর কার্য্যে যাহাই দেখাক্ না কেন, চিন্তায় যেন একটু সাম্য ভাবের পরিচয় দিত। এটি আমাদিগের মতে ঠিক ভাল নহে। আমাদিগের বোধ হয়, ঠিক এইটিই দেখাইবার জন্য কবিবর ভ্রমর-চিত্রটি আঁকিয়াছেন।

ভ্রমরের দুঃখ ও মৃত্যু সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। ভ্রমরের দুঃখ ও যন্ত্রণা সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 'ভ্রমর এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে তাহাকে এত কষ্ট পাইতে হইল? ভ্রমরের যে অপরাধ তাহা অতি সামান্য—সে অপরাধ চক্ষের জলেই মুছিয়া ফেলাইবার যোগ্য, তবে ভ্রমরের এ কষ্ট হইল কেন? ভ্রমর মরিল কেন?' আমাদিগের বিশ্বাস, গোবিন্দলালের চরিত্র স্ফুটন জন্যই ভ্রমরের আবশ্যকতা হইয়াছিল, তাই ভ্রমরের সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উঠিবার সম্ভাবনা কবিকে রাখিয়া দিতে হইয়াছে। গোবিন্দলালের কার্য্য ও পরিণাম, যেরূপ পরিস্কার, ভ্রমরের তাহা নহে। কিন্তু ভ্রমরের চরিত্রেও এমত কিছুই নাই যাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রথমে ভ্রমরের মৃত্যু কথা গ্রহণ কর। ভ্রমরের মৃত্যুতে আমরা এই সকল কারণ দেখিতে পাই।(১) ভ্রমরের হৃদয়ের অবস্থা যেরূপ, গোবিন্দলালের সহিত মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার সম্মিলন অসম্ভব। মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিলাম এই কারণ যে, মৃত্যুর সময় সে সম্মিলনের কোন বাধাই ঘটিতে পারে না—মরিবার পূর্ব্বে অতি পাপীরও পাপ চিত্ত পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়—সামান্য বিবাদের সূত্র কি তখন মনে থাকে? (২) ভ্রমরের মৃত্যু গোবিন্দলালের প্রবল শাস্তি স্বরূপ—ভ্রমর গোবিন্দলালের চরিত্র স্ফুটন জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। (৩) মৃত্যুতেই ভ্রমরের দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল। এইরূপ ভাবে তাহার মৃত্যুতে তাহার সচ্চরিত্রের পুরস্কার ও গোবিন্দলালের শাস্তি বেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। মৃত্যু ভ্রমরের স্বর্গের সোপান—সুখের প্রারম্ভ। (৪) এতদ্ব্যতীত যদি আর কিছু বলিবার থাকে, তাহা এই জগতের রহস্যপূর্ণ কার্য্যাবলী। আজ কল্পিত ভ্রমরের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করা হইল,এ পৃথিবীতে এরূপ অনেককে প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

মৃত্যুটা, যাহা হউক, এক রকম বুঝা গেল। কিন্তু ভ্রমরের সেই সাত বৎসর ধরিয়া কষ্ট পাইবার কারণ ত কিছুই বুঝান হইল না। আমরা তৎসম্বন্ধে এই বলিতে চাহি যে, ওরূপ কষ্ট প্রকৃত কষ্ট নহে—যাহার পরিণাম সুখ, তাহা কষ্ট নহে। তাহা সুখ ভোগের উপায় মাত্র। ঐ রূপ ভাবে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল বলিয়াই, ভ্রমর স্বর্গারোহণ করিল। গোবিন্দলালের প্রতি অভিমান করিয়া তাহার দুশ্চরিত্রের জন্য মোকর্দ্দমা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণে এইটি হইত না। এ কষ্ট সতীর ধর্ম্ম—সতীত্বের পরীক্ষা। এই কষ্ট সুখের সোপান। সংঘর্ষণে বিদ্যুৎ বহির্গত হয়—সংঘর্ষণে, প্রলোভনের সহিত, কষ্টের সহিত সংঘর্ষণে পবিত্র ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। ধর্ম্ম সুখের জন্য, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে কষ্ট সহিষ্ণুতা আবশ্যক।

ভ্রমর-চরিত্রের নীতি।

১। স্বামীকে সর্ব্বদা ভক্তির চক্ষে দেখা উচিত। স্বামী পাপী হইলেও অপরিত্যজ্য ও ঘৃণার অযোগ্য। পাপকে ঘৃণা করিলেই পাপীকে ঘৃণা করিতে হয় না।

বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশে এ কথাটি আবার নূতন করিয়া বলিতে হইতেছে। স্বামী যে স্ত্রীর পরমগুরু, ঈশ্বর লাভের একমাত্র সোপান, পূর্ব্ব কালের আর্য্য রমণীদিগকে এ কথা কাহাকেও শিখাইতে হয় নাই। মধ্যকালে ইহার অর্থ ভুলিয়া গিয়া হিন্দুললনাগণ সংস্কার বশেই এইরূপ মনে করিতেন। আজ কাল এ ভাবের ঔচিত্য লইয়াই তর্ক উঠিতেছে। তর্ক উঠা যে মন্দ, বা কালের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে, একথা আমরা বলিতে পারি না। তবে, তর্কের কালটি বড় অশান্তিতে যায়। যাহাতে এ কথাটি অর্থ শুদ্ধ আবার হিন্দু রমণীর হৃদয়দেশে পাষাণে অঙ্কিত আলেখ্যবৎ সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, এরূপ চেষ্টা এখন অনেকেই করিতেছেন। আমাদিগের কবি তাঁহার প্রায় সমস্ত নবেলেই এ ভাবটি বেশ ব্যাখ্যা করিয়া পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। ভ্রমর ভাবিত যে, যে পর্য্যন্ত গোবিন্দলাল ভক্তির যোগ্য সেই পর্য্যন্তই তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। কিন্তু ভ্রমর আর্য্যরমণী-গর্ভ-সম্ভূত—এ ভাব অবশ্য সম্পূর্ণ কার্য্যে

পরিণত করিতে পারিল না।—তবু তাহার ধারণাও তাহার সর্ব্বনাশ ঘটনা করিল। ভ্রমরের অর্দ্ধেক যাতনা গোবিন্দলালের প্রতি তাহার এই ভক্তির খর্ব্বতা চিন্তায়!

এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি নীতিও ইহাতে পাওয়া যায়। যথা, অহঙ্কার কিছুরই ভাল নহে—রাগের সময়ে কোন কাজ করিতে নাই ইত্যাদি। এগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৩। রোহিণী।

রোহিণীর হৃদয়-রাজ্যের অধিশ্বরী—দুর্দ্দমনীয়া লালসা। এই লালসা দ্বারাই, তাহার চিত্তস্থ গুণ-দোষ গুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, এই লালসা দ্বারাই সুতরাং তাহার জীবনাঙ্ক গুলি বিভাগ করা উচিত।

তাহার জীবনের প্রথমাঙ্কে এই লালসা কিছু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিতে পাই। লালসার একটি যোগ্য বস্তু যে পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহা স্থির হইয়া কোনও এক বস্তু অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না—সর্ব্বদাই সেই লালসার পাত্রগুলি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই লালসা কিন্তু অপূর্ণা—অপরিতৃপ্তা।

রোহিণীকে যখন গ্রন্থকার আমাদিগের মধ্যে পরিচিত করিয়া রাখিয়া গেলেন, আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে পাইলাম, রোহিণী যুবতী—রোহিণী রূপসী, "শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ"। রোহিণী বাল-বিধবা—ইন্দ্রিয়লালসায় অপরিতৃপ্তা—প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় অনিবারিত তৃষা। রোহিণী উচ্ছৃঙ্খলা—অর্থাৎ সমাজ-শাসনের অনধীনা। বিধবা হইয়াও সে তদনুপযোগী অনেকগুলি কদাচার করিত। শুনিতে পাইলাম, রোহিণী রন্ধনাদিতে বিশেষ দক্ষা—কারুকার্য্যে তুলনারহিত। রোহিণী নিরাশ্রয়া—পতিকুলে তাহার কেহই ছিল না, সে পিতৃব্য ব্রহ্মানন্দের আলয়েই বাস-করিত। রোহিণী পাড়ায় বিশেষ প্রতিপত্তিশালিনী—চুল বাঁধিতে কন্যা সাজাইতে পাড়ার একমাত্র অবলম্বন।

রোহিণী রাত্রে ব্রহ্মানন্দের জন্য রাঁধিতেছিল হরলাল সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "হরলাল ঘরের ছেলে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন।" "রোহিণী দালের কাটি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, (পাঠকগণ, ইঁহার প্রত্যেক কথা একটু ভাবিয়া দেখিবেন—রোহিণীর উপযুক্ত

কার্য্যগুলি বর্ণিত হইয়াছে কি না!—ইহাতেও কম বাহাদুরি নাই) 'বড়-কাকা কবে এলেন?' হরলাল বলিল। 'কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা* আছে।'

রোহিণী শিহরিল। বলিল, 'আজ এখানে খাবেন? সোরু চালের ভাত চড়াব কি?' হরলাল। 'চড়াও, চড়াও। কিন্তু সে কথা নয়। তোমার একদিনের কথা মনে পড়ে কি?' রোহিণী চুপ করিয়া মাটিপানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিল, 'সেই দিন, যে দিন তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে, যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে? মনে পড়ে?' রোহিণী। (বাঁ হাতের চারিটী আঙ্গুল ডাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে) 'মনে পড়ে।' হরলাল সে কথা নূতন করিয়া বলিল। বলিবার উদ্দেশ্য ছিল। সে আজ সে উপকারের প্রত্যুপকার প্রার্থী। হরলাল বলিল 'আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার—তার উপর আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার, করিবে?' রোহিণী বলিল 'কি বলুন—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।' হর। 'কর না কর, একথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।' রো। 'প্রাণ থাকিতে নয়।'

গ্রন্থকার রোহিণী সম্বন্ধে যাহা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, তদ্ব্যতীতও আমরা কয়েকটি কথা এখানে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। রোহিণী হরলাল কর্ত্তৃক উপকৃতা হইয়াছে—বদমাসের হাত হইতে রক্ষিতা হইয়াছে, রোহিণী সে উপকারের জন্য হরলালের নিকট ঋণী। সে ঋণ প্রাণ দিয়াও সে পরিশোধ করিতে প্রস্তুত। এটি সদ্‌গুণ সন্দেহ নাই।

কিন্তু হরলাল যখন তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "রোহিণী শিহরিল। বলিল 'চুরি? আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও পারিব না। আর যা বলুন সব পারিব। মরিতে বলেন মরিব। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।' হরলাল পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন, রোহিণী তাহাতে স্বীকার পাইল না। বলিল, 'টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।'

---

* এই রূপ অক্ষরে মুদ্রিত আমরাই করিয়াছি।

রোহিণী অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য—চুরি করিতে প্রস্তুত হইল না। হরলালের জন্য সে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য অধর্ম্ম করিতে প্রস্তুত নহে।

"হরলাল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, বলিল, 'মনে করিয়াছিলাম, রোহিণি, তুমি আমার হিতৈষী। পর কখন আপন হয়? দেখ আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোষামোদ করিতাম না। সেই আমার এ কাজ করিত।' এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল 'হাসিলে যে?' রো। 'আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবা বিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি নাকি বিধবা বিবাহ করিবেন?' হর। 'ইচ্ছা ত আছে—কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই?' রো। 'তা বিধবাই হোক সধবাই হউক—বলি বিধবাই হউক, কুমারীই হউক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেই ভাল হয়। আমরা আত্মীয় স্বজন সকলেরই তা হলে আহ্লাদ হয়।' হর। 'দেখ রোহিণী বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত।' রো। 'তা ত এখন লোকে বলিতেছে।' হর। 'দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবে না?' রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিল, 'দেখ তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম স্নুবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।'

এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, উনুন গোড়ায় বসিয়া, দালে কাটি দিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া (হরলাল কিছু বোকা) হরলাল ফিরিয়া চলিল। হরলাল দ্বার পর্য্যন্ত গেলে, রোহিণী বলিল, 'কাগজ খানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি।' হরলাল জাল উইল ও হাজার টাকার নোট দিল। রোহিণী টাকা ফিরাইয়া উইল খানি রাখিল।

বুঝিলে, পাঠক, এখন রোহিণী স্বীকার পাইল কেন? টাকা গুলি সে ফিরাইয়া দিল, কিন্তু কার্য্য করিতে স্বীকার করিল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে এতদপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ মনে করিতেছিল। ইহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রোহিণীর বুদ্ধি, রোহিণীর সদ্‌গুণ, রোহিণীর অপরিতৃপ্ত যৌবন-লালসার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ছিল। যে পর্য্যন্ত লালসার কোন কথা তাহার মনোমধ্যে উঠে নাই, সে পর্য্যন্ত সে ধার্ম্মিকের ন্যায় দরিদ্র

হইয়াও অত টাকার লোভ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এখন সে লালাসার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িল। তদনুযায়ী বুদ্ধি খাটাইয়া মনে মনে ভাবিল, এতদ্দ্বারা হরলালকে হাত করিতে পারা গেলেও যাইতে পারে। হরলাল বিধবা-বিবাহ করিতে অপ্রস্তুত নহেন, রোহিণীও রূপসী, বিশেষতঃ তাঁহার এক পরম উপকার সাধন করিলে, হরলাল রোহিণীকে বিবাহ করিতে পারেন। অধিক বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া রোহিণী এইটি ভুলিয়া গেল যে, যে ব্যক্তি পিতার সহিত এইরূপ কুব্যবহার করিয়াছে, উইল জাল করিতে চেষ্টা পাইতেছে, সে ব্যক্তি তাহার উপকারে বাধ্য না হইতেও পারে। তবে রোহিণী তাহার নিজের রূপের উপর কিছু বেশি নির্ভর করিয়াছিল, তাই এরূপ লালাসার বশবর্ত্তী হইল। অথবা লালসার বশবর্ত্তী হইয়া ভুল বুঝিল। রোহিণীর এই প্রথম আশা।

রোহিণী কিরূপ বুদ্ধি খাটাইয়া হরলালের কথিত কার্য্য সাধন করিয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে আমরা রোহিণীর বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় পাইয়াছি—রোহিণী অতিশয় চতুরা ও বুদ্ধিমতী।

"পর দিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে। আবার সেখানে হরলাল উকি মারিতেছে। * * হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল—রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিল। 'চাহিয়া দেখ—হাঁড়ি ফাটিবে না।' রোহিণী চাহিয়া দেখিয়া—হাসিল। হরলাল বলিল, 'কি করিয়াছ?' রোহিণী অপহৃত উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। তখন সে দুষ্টের মুখে হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি প্রকারে আনিলে?'"

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, রোহিণী বড় বুদ্ধিমতী ও চতুরা। বড় কৌশল করিয়া ধূর্ত্ত হরলালের নিকট হইতে সে উইল খানি লইয়া তুলিয়া রাখিয়া আসিল। হরলাল উইল চাহিলেন। রোহিণী বলিল 'উইল আমার কাছে থাক।' হরলাল। 'সে কি? উইল আমায় দিবে না?' রোহি। 'তোমার কাছে থাকাও যে আমার কাছে থাকাও সে।' হর। 'যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে, ইহা চুরি করিলে কেন?' রোহি। 'আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল। যখন আপনি বিধবা-বিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দিব। আপনি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।' হরলাল বুঝিল। বলিল, 'তা হবে না—রোহিণী। টাকা যাহা চাও,

দিব।' রো। 'লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে (এখন আর দিবেন বলিয়াছিলেন বলিল না) তাই চাই।' হর। 'তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য?' "রোহিণীর মুখ শুকাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল।" কথাটা বুঝি মর্ম্মে বড় আঘাত করিল। হরলাল বলিল 'আমি যাই হই, কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।' সুপ্ত সিংহী যেন গর্জ্জিয়া উঠিল। "রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাথার কাপড় উচু করিয়া তুলিয়া, হরলালের মুখপানে চাহিল, বলিল, 'আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্ব্বরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে? হায়! হায়! আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর ঝাট দিই, তাই দেখাইতাম! তুমি পুরুষ মানুষ মানে মানে দূর হও।" এই উক্তিটি রোহিণীর মুখে বড়ই সুন্দর লগ্ন হইয়াছে। রোহিণী যদি এখন কাঁদিত, পূর্ব্ব বা পরের চরিত্রের সহিত, তাহা খাপিত না। রোহিণী যদি এখন হরলালকে বাস্তবিকই এমন অযোগ্য না ভাবিত, তাহার হৃদয় খানি এত সুন্দর খুলিত না। এই উক্তিটি রোহিণীরই মত হইয়া ছিল!

হরলাল একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। "রোহিণী খোপাটা একটু আঁটিয়া রাঁধিতে বসিল। রাগে খোপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল। রোহিণীর প্রথম আশা এইরূপে পূর্ণ হইল! জীবনের প্রথমাঙ্ক এইরূপে সমাপ্ত হইতে চলিল!

এ ঘটনাটি অবশ্য রোহিণী শীঘ্র ভুলিতে পারে নাই। এই ঘটনার ফল, চিত্তে আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিজনিত তৃষ্ণা বৃদ্ধি হওয়া। রোহিণী এইরূপ বর্দ্ধিত তৃষ্ণা লইয়া একদিন বাবুদের বারুণী পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে, বকুলের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল। লালসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ধ্যানভগ্ন ধূর্জ্জটির ন্যায় রোহিণী চাহিয়া দেখিল—"সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে

সুর বাঁধা। দেখিল—নবস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চন-গৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধ-পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুণ গুণে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল, সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি-নির্ম্মিত স্কন্ধোপরি পড়িয়াছে—কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল 'কু উ' তখন রোহিণী সরোবর সোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া, কাঁদিতে বসিল।"

এ কান্নার অর্থ পরিস্কার। গ্রন্থকার তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "রোহিণী বোধ হয় ভাবিতেছিল, যে কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে এরূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মতন ইহ-জীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?"

গোবিন্দলাল আসিয়া সেই দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, 'তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না?' রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। এই রোহিণীই হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল!

কারণ জটিল নহে। রেহিণীর হৃদয়ে এখন প্রেমরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—রোহিণী এখন সেই ভাবে বিভোর—সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা ; কথা কহিবে কি? এইরূপ ক্ষুদ্র কার্য্যেও গ্রন্থকারের সূক্ষ্মদৃষ্টিটুকু রহিয়াছে! অবশেষে রেহিণী বলিল 'একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।

রোহিণীর মনে গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তি জন্মিল। তাহার জীবনের দ্বিতীয়াঙ্ক আরম্ভ হইল। তাহার লালসা কেন্দ্রীভূত হইয়া গোবিন্দলালকে জড়াইয়া ধরিল। গোবিন্দলালের প্রতি এই আসক্তির কারণ গ্রন্থকার এই রূপে ব্যাখ্যা করিলেন। "কেন যে এতকালের পর, তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখন তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানিনা। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি—সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ (এইটি অতি সুন্দর কারণ)—এই সকল উপলক্ষে কিছু কাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না,—যেমন ঘটিয়াছে আমি তেমনি লিখিতেছি।" দেখিলাম কেবল রূপ ইহার কারণ নহে, এই আসক্তির মূলে অনেক আছে।

রোহিণীর বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তাহার এ লালসা কখনই পূর্ণ হইবার নহে। রোহিণী মনে মনে মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। রোহিণীর এখন আর একটি দায় হইল। সে উইল খানি কিরূপে পরিবর্ত্তিত করিবে? ব্রহ্মানন্দেরও ক্ষতি না করিয়া, নিজেরও দোষটি লুকাইয়া রাখিয়া, সে আবার ঐরূপেই প্রকৃত উইল রাখিয়া জাল উইল আনিতে সঙ্কল্প করিল।

নিশীথ কালে, রোহিণী প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্তের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রোহিণী পূর্ব্বের ন্যায় উইল বাহির করিবে, এমনি সময়ে কৃষ্ণকান্ত জাগ্রত হইলেন। রোহিণী বুঝিল যে কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে

—বুঝিয়া, নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, 'কে ও?' কেহ কোন উত্তর করিল না। "সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল—একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।" উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে গেলে সকলকেই এইরূপ ভীত হইতে হয়। "কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয়েক ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতীকার করা হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, 'দুষ্কর্ম্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজি সৎকর্ম্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।' রোহিণী পলাইল না।"

ইহার পরে সে এরূপ স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা ও সাহসের সহিত উইল খানি বদ্‌লাইয়া কৃষ্ণকান্তের সমীপে দাঁড়াইয়া রহিল, যে তাহা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন 'কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত?'

রোহিণী পূর্ব্বে যে লালসার বশবর্ত্তী হইয়া হরলালের জন্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, আজিও প্রায় সেই লালসারই বশবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দলালের হিতসাধনে তৎপর হইল। তাহার লালসাই জীবনের অধীশ্বরী, কার্য্যের নিয়ামক। গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আসক্তি, এখন রোহিণীর স্থির মনের সদসৎ বিবেচনার সহিত যুক্ত হইল; রোহিণী পরম ধার্ম্মিকার ন্যায় গোবিন্দলালের জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল—সে এখন ইহার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নহে। রোহিণীর ন্যায় যুবতী স্ত্রীলোকের হৃদয়ে যৌবন-লালসার এইরূপই আধিপত্য বটে।

রোহিণী ধরা পড়িল—ধরা পড়িয়া আবদ্ধ রহিল। গোবিন্দলাল পর দিন প্রাতে সদর কাছারিতে গিয়া দেখা দিলেন। রোহিণী তাঁহার প্রতি "ক্ষণিক কটাক্ষ' করিল। গোবিন্দলাল দয়া প্রদর্শন করিয়া সকল কথা ভালরূপে জানিতে তাহাকে অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। ক্ষণেক পরে নিজেও তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রোহিণী-জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক এই রূপে শেষ হইল।

রোহিণীর জীবনের তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল। এ অঙ্কে রোহিণী তাহার লালসা ফলবতী করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। গোবিন্দলালকে হৃদয়ের কথা

বলিবার এই সুযোগ। এই বলায় অন্য কিছু ফল না হউক, তাহার ত একটু সুখ হইবে? বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, বলিলে এ কষ্টটুকু ত দূর হইবে?

রোহিণী বলিল, তাহার কথা গোবিন্দলালের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। "গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখন কখন বিশ্বাস করি।' রোহিণী মনে মনে বলিল, 'নহিলে আমি তোমার জন্য মরিতে বসিব কেন? **যাই হউক, আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।'"**

রোহিণীর মনে গোবিন্দলালের গুণও স্থান পাইয়াছিল। গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তিতে কেবলই যে অপবিত্রতা ছিল, এরূপ কথা আমরা কোন মতে স্বীকার করিতে পারি না। যাহা হউক, সে কথা আমরা অন্যত্র বলিব।

"আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব" এই কথার অর্থ এই যে, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, আমার এ অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি কি না। রোহিণীর জীবনের এই অঙ্কের মূল মন্ত্রই এইটি।

রোহিণী বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে কথা বলিলে কি হইবে? গোবিন্দলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। "রোহিণী বলিল, 'আমার মাথা মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।—এ কলঙ্কের পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। বাকি এই কেশ'—এই বলিয়া, রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণ তড়াগ-তুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিতে লাগিল—'এই কেশ—আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌ ঠাকুরুনের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকল গুলি কাটিয়া দিয়া

যাইতেছি।' গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'বুঝেছি রোহিণি! কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে, অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।'"

রোহিণী এইবার কাঁদিল। হৃদয় মধ্যে গোবিন্দলালকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিল। আর্ত্তের দুঃখ সহানুভাবকে বুঝিল—তাই রোহিণী কাঁদিল। সেই সহানুভাবক আবার গোবিন্দলাল, তাই রোহিণী কাঁদিল।

শেষে রোহিণী বলিল, হরলাল বাবুর অনুরোধেই সে প্রথমে প্রকৃত উইল আনিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, এবারে সে জাল উইল লইয়া প্রকৃত উইল রাখিয়া আসিয়াছে। গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।' "রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল 'না অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখন পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখন পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।" রোহিণী গোবিন্দলালের ওরূপ প্রশ্নের অন্য রূপ উত্তর করিতে পারিত। কিন্তু তাহা তাহার উদ্দেশ্য নহে। রোহিণী এবারে গোবিন্দলালকে পরীক্ষা করিতে বসিয়াছে।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি সে রোহিণি?' রো। 'সেই বারুণী পুকুরের তীরে মনে করুন।' গো। 'কি, রোহিণি!' রো। 'কি? ইহজন্মে, আমি বলিতে পারিব না—কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অন্য উপকার করিতে পারেন না—কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন—**একবার ছাড়িয়া দিন কাঁদিয়া আসি।** তারপর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, দেশ ছাড়া করিয়া দিবেন।'

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। তিনি রোহিণীকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। রোহিণীর মনে এখনও স্থির বিশ্বাস হয় নাই, যে গোবিন্দলাল তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল 'কেন?' গো। 'তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও।' চতুরা রোহিণী উত্তর করিল, 'আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন

কেন?' গোবিন্দলাল বলিলেন, 'তোমায় আমায় আর দেখা শুনা না হয়।' "রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে, বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।"

রোহিণী যাইতে মুখে রাজি হইয়া বিস্তর আপত্তি করিল। শেষে বলিল 'আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে? তিনি আমাকে সহজে ছাড়িবেন কেন?' গোবিন্দলাল বলিলেন 'আমি অনুরোধ করিব।' তখন ধূর্ত্তা রোহিণী বলিয়া বসিল 'তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।' কথাটায় যেন রোহিণীর চতুরতাটুকু মাখান রহিয়াছে। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাইতে বলি-লেন। "রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ হইল।" রোহিণীর পরীক্ষা শেষ হইল। তাহার জীবনের চতুর্থ অঙ্ক আরম্ভ হইল। আশা ফলবতী হইবার নহে। এ অঙ্কে মাত্র নিরাশার যন্ত্র-ণার সহিত জীবিতেচ্ছার বিসম্বাদ দেখিতে পাই।

"রোহিণী, গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল। 'এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দ-লালকে ত দেখিতে পাইব না। আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির! এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান। এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। শ্মশানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে! আমি যদি এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া না যাই, ত আমার কে কি করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশ ছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক,—তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত, যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।'"

"এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কালামুখী রোহিণী উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া

আবার—‘পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ’—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল,—‘হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু—রাখিব কি প্রভু—হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।’ তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না। কখন ভাবিল গরল খাই, কখন ভাবিল গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি, কখন ভাবিল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।”

আমরা দেখিলাম রোহিণীর অতি ক্ষীণ সাধু-জীবন যেন পাপ-বিষ পান করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

রোহিণী গোবিন্দলালের নিকট বলিয়া আসিল, সে কোথাও যাইতে পারিবে না। এ দিকে যন্ত্রণাও সহ্য করিতে পারিল না। বারুণী পুকুরে ডুবিয়া মরিতে গেল। গোবিন্দলাল তাহাকে উদ্ধার করিলেন। রোহিণী বলিল, ‘আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল?’ গোবিন্দলাল বলিলেন, ‘যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই যথেষ্ট।’ রোহিণী বলিল, ‘আমাকে কেন বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী?’ গো। ‘তুমি মরিবে কেন?’ রো। ‘মরিবারও কি আমার অধিকার নাই।’ গো। ‘পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।’ রো। ‘পাপ পুণ্য আমি জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? (হায়! এইরূপ চিন্তায় যে কত শত সহস্র লোককে পাপ পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? জগতের এ রহস্য কবে সকল লোকে ভাল করিয়া বুঝিবে?) আমি মরিব। এবার না হয়,

তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার, যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি সে যত্ন করিব।' গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন ; বলিলেন 'তুমি কেন মরিবে ?' 'চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, একবারে মরা ভাল।' গো। 'কিসের এত যন্ত্রণা ?' রো। 'রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।' গোবিন্দলাল তখন বলিলেন, 'আর এ সব কথায় কাজ নাই—চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।' রোহিণী বলিল, 'না আমি একাই যাইব।' গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি।"

রোহিণীর জীবনের আর এক অঙ্ক অভিনীত হইয়া গেল।

এই অঙ্কটি লইয়া রোহিণী সম্বন্ধে দুই প্রকার মতের বিরোধ দেখা গিয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

১ম মত। রোহিণীকে তোমরা পাপিষ্ঠাই বল, আর দুশ্চারিণীই বল, তাহা এখন বলিতে পারিবে না। এখন রোহিণীর হৃদয়ে অকপট, সুতরাং পবিত্র, প্রেম-লালসার সহিত, তাহার অন্তরস্থিত স্বাভাবিক সততার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে—রোহিণীর চিত্তভূমি তাহাতে দলিত হইয়া যাইতেছে। সদসতে, সুমতি-কুমতিতে যাহার হৃদয়-মধ্যে এইরূপ সাংঘাতিক সংগ্রাম করে, সে কখনও দুশ্চারিণী বলিয়া ঘৃণার যোগ্য নহে। আর রোহিণীর অপরাধই বা কি? সে বালবিধবা—সমাজ-শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে পুনরবিবাহিতা রহিয়াছে, গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আসক্তিতে এত পাপ মনে কর কেন ? গোবিন্দলালের ভ্রমর ছিল, রোহিণীর ত স্বামী ছিল না ? তবে রোহিণী যদি সরলচিত্তে গোবিন্দ-লালের অনুরাগিনী হইয়া থাকে, তবে তাহাতে পাপের কথা আসিবে কেন ? তোমরা বলিবে, রোহিণীর এ লালসাটি সম্পূর্ণ রূপতৃষ্ণা—আমরা বলিব, তাহা বুঝিলে কিসে ? গোবিন্দলাল শুদ্ধ রূপবান ছিলেন এরূপ নহে, গুণবান্‌ও বটে। আর শুদ্ধ রূপের যদি আধিপত্য এত থাকিবে, তবে পূর্ব্বে এ আসক্তি সঞ্জাত হয় নাই কেন ? রোহিণী যে গুণগ্রাহী, তাহার ত আমরা প্রমাণ পাইয়াছি ? হরলালকে সে যদেচ্ছা গালি পাড়িয়া-ছিল, গোবিন্দলালের সহানুভূতিতে সে আর্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল ! তাহার যে হৃদয় নাই—গুণগ্রাহিতা নাই, প্রেম নাই, একথা তুমি কিসে বল ?

বিশেষ গ্রন্থকারেরও মত দেখ। তিনি লিখিতেছেন "তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয় থামিল না"। ইহার অর্থ কি? 'প্রেম' অর্থ 'ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা' নহে। তবে গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তিতে তোমরা এত সন্দেহ কর কেন?

২য় মত। রোহিণীর যদি শুদ্ধ এই ভাবটি দেখিতাম, তবে না হয় তাহাকে দয়া করা যাইত। তাহার প্রতি সমবেদনার সঞ্চার হইতে পারিত! কিন্তু এই রোহিণীই ত হরলালকে বিবাহের জন্য এক জনের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল? এই রোহিণীই ত ভ্রমরকে ঘোর প্রবঞ্চনা করিয়া বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল? এই রোহিণীই ত আবার রূপ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দলালকে ছাড়িয়া নিশাকরকে দেখিতে গিয়াছিল? একে যদি তোমাদের সহানুভূতি দেখাইতে হয় দেখাও, আমরা পারিব না। তাহার হৃদয়ে যে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ দেখিতে পাও, সেটি প্রথম পাপাচারণের সময় প্রত্যেক পাপীরই হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। রোহিণীতে মাত্র সেই স্বাভাবিকী সততার অঙ্কুরটুকু ছিল—তাহা সে যত্ন করিয়া কোনও দিন পরিবর্দ্ধিত করে নাই। সে স্বাভাবিকী সততার জন্য কি তাহাকে প্রশংশা করিতে হইবে? তোমরা বলিতেছ, সে বাল-বিধবা, তাহার এই রূপ লালসাবতী হওয়াতে কোন পাপ নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করিব, রোহিণীর কি সেইরূপ বিশ্বাস ছিল? তবে রোহিণী বলিবে কেন "আমি বিধবা—ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল *"? রোহিণী যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা দেখিয়া হরলালকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এরূপ প্রমাণ ত আমরা পাই নাই। তবে রোহিণী যদি এইরূপ আসক্তিতে পাপ মনে করিয়া তাহাতে নিরতা হয়, তবে সে পাপিষ্ঠা নয় ত কি? দুশ্চারিণী নয় ত কি? সামাজিক বন্ধন ভিন্ন আরও একটি বন্ধন আছে—সেটি ধর্ম্মের। মানিলাম যেন রোহিণীর সামাজিক বন্ধন এতদ্দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ধর্ম্মের বন্ধন ত ছিন্ন হইল! সে নিজে জানিয়া শুনিয়া ত তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিল, তবে রোহিণী সাধ্বী হইবে কিরূপে? গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তিতে যে ভোগ-লালসা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল, এরূপ ত বোধ হয় না। গোবিন্দলাল গুণবান্ সত্য, কিন্তু তাহাতেই যে বুঝিতে হইবে, রোহিণী তাহার গুণেও মুগ্ধ ছিল, এরূপ কোন কথা নাই। বিশেষ গোবিন্দলালের গুণ যে রোহিণীতে

মজিলে দোষ হইয়া পড়িবে, রোহিণী কি তাহা বুঝিত না? রোহিণী নির্ব্বোধ নহে! যে গোবিন্দলাল তাহার লাগিয়া, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবে, রোহিণী যে বড় একটা সেই গোবিন্দলালের গুণে মুগ্ধ হইবে, এরূপ ধারণা আমাদিগের নাই। তোমরা গ্রন্থকারের দোহাই দিয়া বলিতেছ, তিনি বলিয়াছেন, রোহিণীর হৃদয় প্রেমপরিপূর্ণ ছিল। আমরা বলিব, এখানে "প্রেম" কথাটি ঠিক ব্যবহৃত হয় নাই। অথবা 'প্রেমের' অর্থ, এইখানে, লালসার প্রাবল্য-জনিত হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাব বিশেষ। প্রেমের সহিত ইহার এই সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই হৃদয়োন্মাদকর।

১ম মত। শৈবলিনীকে মনে পড়ে? প্রতাপের জন্য তাহার আসক্তি আর গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তিতে বেশী প্রভেদ আছে কি?

২য় মত। তোমরা কি বলিতেছ? প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর প্রণয়ের সূচনাভাগটুকু পড় দেখি? সেই বালক-বালিকার প্রণয়ে কি যৌবনের চাঞ্চল্য ছিল? যদি তাহাতেও তোমরা রূপোন্মাদের কথা বল, আমরা বলিব তাহাতে কোন অপবিত্রতা ছিল না। সে উন্মত্ততায় সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিকী পবিত্রতা ভিন্ন অন্য কিছুই লক্ষিত হয় না। আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তির কারণগুলি দেখ ত? বিনা সংসর্গে এই প্রণয়ের সৃষ্টি কি অসম্ভব নহে?

১ম। ভবভূতির সেই কথা মনে পড়ে?

"ভূয়সা জীবিধর্ম্ম এষ যদ্রসময়ী কস্যচিৎ কৃচিৎ প্রীতিঃ * * তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমাণমামনন্তি।" যদি নিষ্কারণেই প্রেম জন্মিতে পারে, তবে এসকল কারণে তাহা জন্মিবার বাধা দেখি না।

২য়। যদি রোহিণীর আসক্তি প্রেমই হইবে, তবে নিশাকরকে দেখিয়া সে ওরূপ করিয়াছিল কেন?

১ম। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে নিশ্চয়ই ভাল বাসিতেন। তবে, রোহিণীকে দেখিয়া তিনি ওরূপ হইয়াছিলেন কেন?

২য়। ভ্রমর কালো।

১ম। মূর্খ! ভ্রমর কালো না হইলে কি গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণা মিটিত? রূপতৃষ্ণা অনেক স্থলে নূতনের বাসনার সহিত যুক্ত। গোবিন্দলালের চক্ষু অপেক্ষা নিশাকরের চক্ষু সুন্দর ছিল, এও ত একটা কারণ হতে

পারে? বিশেষ রোহিণী ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে কখন গোবিন্দলালের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইবে না?

২য়। মনে মনে ঐরূপই ভাবিয়া থাকে বটে। গোবিন্দলালও একদিন ঐরূপই ভাবিয়াছিলেন। ও কেবল "মনকে চোখ ঠার দেওয়া।" উহার ভিতরে কিছুই নাই।

আমরা এরূপ তর্কজাল আর বিস্তৃত করিতে চাহি না। আমাদিগের নিকট রোহিণীর চিত্রে একটি গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে—প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যাখ্যাত হয় নাই। আমরা সে রহস্য ভাল করিয়া বুঝি না। বুঝিনা, কিন্তু এ জগতে এরূপ অনেক রহস্যের কথা শুনিয়া থাকি। রোহিণীর আসক্তি 'প্রেম' কিনা, তাহা প্রেমের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে। যে দুশ্চরিত্রা তাহাকে যে পূর্ণ মাত্রায়ই দুশ্চরিত্রা হইতে হইবে, এরূপ বিশ্বাস আমাদিগের নাই। রোহিণী যে পাপিষ্ঠা, একথা আমরা একশতবার বলিতে পারি।

ইহার পরে রোহিণী কিরূপ করিয়া যে ভ্রমরকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিষবৃক্ষ রোপণ করিল, কিরূপ করিয়া যে গোবিন্দলালের সহিত মিলিত হইল, কিরূপ করিয়া যে নিশাকর দাসের সহিত গোবিন্দলালের তুলনা করিল, "বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে, যে বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ্ ফরশা—কিন্তু এর মুখ চোক ভাল। ইত্যাদি—",কিরূপ করিয়া তাহার নিকটে গিয়া অতি জঘন্য কুলটার মত কথাবার্ত্তা বলিল, "আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? এক জনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজি তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।", মৃত্যু সময়ে কিরূপ করিয়া তাহার মরণে অনিচ্ছা জানাইল, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনি যাইতেছি। আমায় মারিও না।", তাহা আমাদিগের বলিবার আবশ্যক নাই। তাহাতে রোহিণীর প্রতিহিংসাবৃত্তি, দুষ্টবুদ্ধি, কুলটার ব্যাপকতা বেশ খুলিয়াছে।

রোহিণীর জীবনাঙ্কগুলি এইরূপ।

প্রথম অঙ্কে—বিক্ষিপ্ত লালসা—লালসার পাত্রান্বেষণ।

দ্বিতীয় অঙ্কে—লালসা কেন্দ্রীভূত—গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তির সঞ্চার।

তৃতীয় অঙ্কে—লালসা পরিতৃপ্তির চেষ্টা।

চতুর্থ অঙ্কে—দুর্দ্দমনীয় লালসা পরিতৃপ্ত করিতে না পারিয়া আত্ম-হত্যায় ইচ্ছা।

পঞ্চম অঙ্কে—অনর্থক কলঙ্কের জন্য কলঙ্ক-রটনাকারী ভাবিয়া ভ্রমরের উপর জাতক্রোধ—প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বুদ্ধি নিয়োগ।

ষষ্ঠ অঙ্কে—আশার সঞ্চার—ফললাভ।

সপ্তম অঙ্কে—তৃপ্তি ও নিশাকরের প্রতি লালসার পুনরভ্যুদয়—মৃত্যু।

রোহিণীর দুইটি গুণ ছিল—বুদ্ধি ও প্রেম। সুশিক্ষার অভাবে সেই বুদ্ধি কিরূপ কুকার্য্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, সেই প্রেম কিরূপ ভোগেচ্ছায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা সুন্দর দেখান হইয়াছে। ধর্ম্ম কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইলে আমাদিগের চিত্তের স্বাভাবিকী সদ্বৃত্তিগুলি কিরূপে অসৎ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, রোহিণী তাহা জ্বলন্ত ভাষায় শিক্ষা দিতেছে।

নীতি।

রোহিণী-চরিত্রের ইহাই সার নীতি যে, প্রেম বল আর যাহাই বল, ধর্ম্ম-বন্ধন ভিন্ন তাহা স্থায়ী ও পবিত্র থাকিতে পারে না।

গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর যে আসক্তি ছিল, তাহা যে কিছুই নহে, একথা আমরা বলিতে পারি না। আমাদিগের বিশ্বাস সেইটি পাপ-সংযুক্ত প্রেম। 'প্রেম' কথাটির মধ্যে যদি পবিত্রতার ভাবটুকু নিহিত থাকে, তবে তাহা বাদ দিয়া অন্য যাহা থাকিবে, তাহাই রোহিণীর ছিল। ইহাকে "প্রেম" বলিতে গ্রন্থকারের কোন অপরাধ হয় নাই। ঐ ধর্ম্মভাব-টুকু ছিল না বলিয়া, রোহিণী নিশাকরের রূপে মুগ্ধ হইতে সঙ্কুচিত হয় নাই, বা পাপ মনে করে নাই।

প্রথমে গোবিন্দলালকে অধঃপাতিত করিতেই রোহিণী সৃষ্ট হয়। কিন্তু গোবিন্দলালের ন্যায় চরিত্রের অধঃপতন একটা অবিমিশ্রিত পাপের চিত্র দ্বারা দেখাইতে পারা যায় না, তাই রোহিণীতে পাপের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা সদ্‌গুণের মিশ্রণ রাখিতে হইল। জগতেও এই রূপই থাকে বটে। অবিমিশ্র পাপের চরিত্র অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জন্য আমরা রোহিণীকে গোবিন্দলালের জন্য অধীর হইয়া জলনিমগ্না দেখিতে

পাইলাম। ইহার জন্যই আমরা রোহিণীকে সামান্য কুলটা ভাবে না দেখিয়া, প্রথমে একটু অন্যরকম দেখিতে পাইলাম। কন্তি গ্রন্থকার অঙ্কিত করিতেছেন, পাপের চিত্র, রোহিণীর ভদ্রত্ব রাখিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া উঠে না, সুনীতির অবমাননা করা হয়, তাই আবার রোহিণীকে সামান্য কুলটার মত করিতে হইল। রোহিণীকে লইয়া গ্রন্থকারের বড়ই কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি রোহিণীকে যেখানে যেরূপ ভাবে দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই খানে তাহাই পারিয়াছেন সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ রোহিণীর চিত্রের রহস্য আমরা ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রোহিণী-চিত্রে বড়ই কাব্যনৈপুণ্য আছে, কিন্তু আমরা ৪।৫ দিন ভাবিয়া তাহা না দেখানই ভাল মনে করিয়াছি। অনুতাপশূন্য পাপীর চিত্র আর বেশী খুলিলে কি হইবে? রোহিণী শাস্তিভোগ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। এরূপ মহাপাপিষ্ঠার ভাগ্যে বুঝি তাহাও ছিল না।

৪। ক্ষুদ্র চরিত্রাবলী।

কৃষ্ণকান্ত রায় ঠিক আমাদিগের সেকেলে বড় মানুষ। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সংসার-জ্ঞান, তাঁহার পাড়াগাঁয়ে বড়মানুষি ও প্রতাপ, তাঁহার কার্য্যকলাপে দর্পণবৎ প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত রায় প্রাচীন কালের বুদ্ধিমান হিন্দু জমীদারের অবিকল অনুকৃতি। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা, এখনকার জমীদারবর্গের অনুকরণ-যোগ্য।

হরলাল এক জন উদ্ধত যুবক। হরলাল সম্বন্ধে আর যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা রোহিণীকে লইয়া। রোহিণী ইচ্ছা করিয়াছিল, হরলাল তাহাকে বিবাহ করিলে, সে সেই উইল খানি ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু হরলাল অতি অপদার্থ হইলেও, বিষয়লোভে রোহিণীকে বিবাহ করিতে চাহিল না। রোহিণী যখন বলিল "লক্ষ টাকা দিলেও নয়, যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।" হরলাল উত্তর করিল "তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য? আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।" বংশজাত মহত্ব একেবারে লোপ হইতেই পারে না। এই জন্যই আমাদিগের সমাজে বংশের এত মর্য্যাদা। আর এক কথা। পাপীও অন্যের পাপকে ঘৃণা করে। হরলাল যাহা, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু তবু হরলাল রোহিণীকে ঘৃণা করিল।

কেবলমাত্র পাপে আসক্তিই স্বাভাবিক এমত নহে, পুণ্যে আসক্তিও সেই রূপই স্বাভাবিক। মহত্ত্ব সকলেরই নিকট আদরের জিনিস।

হরলালের পর ব্রহ্মানন্দ। এইরূপ ব্রহ্মানন্দ প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই আছে। ব্রহ্মানন্দের চিত্রের যেটুকু রঙ্‌ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ আগাগোড়াই এক ছাঁচে ঢালা। তাহার গোবিন্দলালের নিকট পত্র খানিও ঐ ধরণে লিখিত। ব্রহ্মানন্দের চরিত্র সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। সেটি রোহিণীর পাপে তাহার সম্মতি প্রদান। এটিও ব্রহ্মানন্দের চরিত্রে বেশ খাপিয়াছে। যে শুদ্ধ জেল ভয়ে পাপ-কার্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল, নিঃশঙ্কচিত্তে যে পাপাচারণ করিয়া অর্থ লাভ হয়, তাহাতে তাহার অসম্মতি হইবে কেন? এইরূপ অভিভাবকের হাতে পড়িয়া কত লোকে মারা পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা আছে কি?

গোবিন্দলালের মাতার সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। গ্রন্থকার বলিতেছেন "আমার এমন বিশ্বাস আছে যে গোবিন্দ-লালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন; বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্না হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্ট কামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। * * * * * তিনি ভাবিলেন যে পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধি-কারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়া ইহজীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামি-বিয়োগ কাল হইতেই কাশী যাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহ বশতঃ এতদিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।" যাঁহারা

স্বাভাবিক চিত্র স্বাভাবিক চিত্র করিয়া বড় গোলযোগ করেন; তাঁহারা দেখুন, বঙ্কিম বাবুর আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্রচরিত্রগুলিতে কোথাও তাহার অভাব আছে কি না। ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি স্বাভাবিক, কারণ ইহার উদ্দেশ্য প্রধান চরিত্রের স্ফূর্ত্তি মাত্র। আর প্রধান চরিত্রগুলি সর্ব্বস্থানে স্বাভাবিক হইতে পারে না, কেন না তাহা কবির উদ্দেশ্য অনুযায়ী কল্পিত। গোবিন্দলালের মাতাকে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরেই প্রায় দেখা যায়। তাঁহাদিগকে সাবধানতা শিক্ষা দিবার জন্য ইহা একটি সুন্দর ক্ষুদ্র চরিত্র।

মাধবীনাথ কৃষ্ণকান্তের ছাঁচে ঢালা। প্রাচীন বয়সে মাধবীনাথ কৃষ্ণকান্তের মতই হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। মাধবীনাথ সংসারী, বুদ্ধিমান হিন্দুর একটি উজ্জ্বল চরিত্র। উজ্জ্বল বলিয়াছি বলিয়া তাহা আদর্শ-চরিত্র বলি নাই। তাহা হইলে, আবার, সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতার তর্ক আসিয়া পড়িবে। কিন্তু বলিতেছি যে, এখনকার দিনে সচরাচর যে বুদ্ধিমান প্রৌঢ় হিন্দু দেখিতে পাই, তাহা এই শ্রেণীর। যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারের পরিচয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। "তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।" মাধবীনাথের একটি কথা, কন্যার পিতা মাত্রেরই জানা উচিত। সেটি মাধবীনাথের উইল সম্বন্ধে ভ্রমরের প্রতি উপদেশ। কন্যার পিতা এইরূপেই কন্যাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন। স্ত্রীলোকের অহঙ্কার বাড়াইতে নাই।

নিশাকর মাধবীনাথের উপযুক্ত বন্ধুই বটে। তাহার বুদ্ধির পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল তাহার একটি চিন্তার কথা বলিব। নিশাকর রোহিণীর জন্য ফাঁদ পাতিয়া ঘাটে বসিয়া ভাবিতেছে "আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুকন্যার জীবন রক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি

বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ-পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয় ত, তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।'" বুদ্ধিমান নিশাকরের চিন্তা জগতের একটি অতি গুরুতর রহস্য। এ রহস্য ব্যাখ্যা হয় নাই বটে, কিন্তু উল্লেখও অনেক স্থলে ব্যাখ্যা সদৃশ।

যামিনী-চরিত্রে কিছুই নাই। এতদ্ভিন্ন পোষ্ট বাবু, সোণা, রূপা, সাক্ষী, ইনস্পেক্টর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে কল্পনার প্রশংসা নাই সত্য, কিন্তু বর্ণনার প্রশংসা আছে।

৫। ভাষা—বর্ণনা—ঘটনা—মন্তব্য।

বঙ্কিম বাবুর ভাষা সম্বন্ধে বেশী বলিতে হইবে না। ইহার ক্রম বিকাশ আমরা সর্ব্বশেষে তুলনার সময়ে দেখাইব।

বর্ণনার শরীর ভাষা—প্রাণ দৃষ্টি। এই দৃষ্টি দ্বিবিধ। সাধারণভাবে বস্তুগুলি সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি,—আর মনের সহিত তাহার সম্বন্ধ যোগ করিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টি। এক দৃষ্টির বিষয় শুদ্ধ বাহিরের বস্তু, অন্য দৃষ্টির বিষয় অন্তরের সহিত তাহার সম্বন্ধ। বারুণী-তীরের বর্ণনাটি দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টি সম্ভূত—দশম পরিচ্ছেদের প্রভাত বর্ণনাটি প্রথম প্রকারের দৃষ্টি সম্ভূত। একপ্রকারের বর্ণনা, স্থলবিশেষে যত সুন্দর, অন্যত্র তত সুন্দর নহে, অন্যটি সর্ব্বত্রই সমভাবে পাঠকের চিত্ত আকর্ষিত করিবে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ বিশুদ্ধ প্রথম প্রকারের বর্ণনার তত মনোহারিত্ব নাই, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনায় প্রথম প্রকারের বর্ণনা থাকিয়া স্থানে স্থানে বড়ই রমণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা মধ্যে প্রথম প্রকারের বর্ণনাও অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রথম প্রকারের বর্ণনা বস্তুর, দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা বস্তু ও ভাবের। আর এক প্রকার বর্ণনা আছে, তাহা ভাব ও বস্তুর। এ স্থলে ভাবই বর্ণনার বিষয়, বস্তুর অবলম্বন তাহারই জন্য। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনায় বস্তুই পরিস্ফুট, ভাব কিছু প্রচ্ছন্ন। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে, বারুণী-পুকুরের সেই কোকিলের ডাকই সেই স্থলের বর্ণনীয় বিষয়, তাহাই বেশ পরিস্ফুট, কিন্তু তাহার সঙ্গে মানব-মনের যে সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, রোহিণীর মনের প্রতি তাহার ক্ষমতা কিছু

প্রচ্ছন্ন। আবার ভ্রমর-গোবিন্দলালের বিচ্ছেদ বর্ণনায় বিচ্ছেদই মূল বিষয় —অন্য যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা তাহারই জন্য। প্রথমোক্ত উদাহরণ-টিতে কিছু গোল থাকিতে পারে, যাহা হউক তাহাতেই আমাদিগের কথার অর্থ স্পষ্ট হইয়াছে। এই ভাব-বর্ণনায় বঙ্কিমবাবু কবিত্বের অতি সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'কৃষ্ণকান্ত উইলের' পাতায় পাতায় এইরূপ ভাব-বর্ণনা রহিয়াছে—এবং তাহা রহিয়াছে বলিয়াই চরিত্রগুলি এত বিকশিত দেখা যায়। আমরা যাহাকে মন্তব্য (Reflection) বলি, তাহাও এই প্রকৃতির। প্রভেদ এই যে,ভাব বর্ণনা উপন্যাসের অঙ্গ —মন্তব্য তাহা নহে। হরলালের টাকাগুলি লইয়া ব্রহ্মানন্দের চিন্তায়,সুন্দর ভাব-বর্ণনা আছে ; আবার তাহা সাধারণ্যে (Generalize করিয়া) খাটাইয়া লেখায়, সুন্দর মন্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত বা ঘটনাগত ভাব লইয়া তাহা সর্ব্বত্র সঙ্গত করাই প্রায় মন্তব্যের অর্থ। সুমতি কুমতির দ্বন্দগুলি সুন্দর ভাব বর্ণনা, আবার "সুমতি কুমতির বিবাদ বিষম্বাদ মনুষ্যের সহনীয়, কিন্তু সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তি জনক। তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি সুমতির রূপ ধারণ করে। সুমতি কুমতির কাজ করে, কুমতি সুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি কে কুমতি চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।" ইহা একটি সুন্দর মন্তব্য। "রূপে মুগ্ধ ? কে কার নয় ? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি ? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল। গোবিন্দলাল এইরূপ ভাবিলেন।" এইখানে আমরা ভাব-বর্ণনা পাইলাম। আবার "পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যা-কর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বৰ্দ্ধিত হয়।" এইখানে আমরা একটি মন্তব্য পাইলাম। বঙ্কিম বাবুর এই দুইটি বর্ণনা শক্তি অতীব বিস্ময়কর। ইংরাজীতে জর্জ্জ ইলিয়টের নবেল ভিন্ন অন্য কোথাও প্রায় আমরা এই শক্তির এত বিকাশ দেখি না। বঙ্কিম বাবু যেরূপ কবি—সেইরূপই দার্শনিক। যেরূপ তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি দার্শনিক-প্রতিভা আছে, সেইরূপই আবার তাঁহার কল্পনা ও তাহা সাজা-ইবার ভাষা আছে। তাহার 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই দুইটি শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি।

বাস্তবিক দার্শনিক প্রতিভা আছে বলিয়া তাঁহার কাব্যগ্রন্থ শুদ্ধ মনোরঞ্জন না করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে। পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, অনেককেই বঙ্কিম বাবুর মতে আসিতে হইবে। ইহাই তাঁহার উপন্যাসের কম প্রশংসা নহে!

কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রধান ঘটনা গুলি এই ঃ—১। রোহিণীর উইল চুরি। ২। রোহিণীর আসক্তি। ৩। রোহিণীর আত্মহত্যার চেষ্টা—গোবিন্দলালের আসক্তি। ৪। গোবিন্দলালের কলঙ্ক রটনা। ৫। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ও উইল। ৬। গোবিন্দলালের অনুসন্ধান। ৭। রোহিণীর মৃত্যু। ৮। ভ্রমরের মৃত্যু—গোবিন্দলালের মৃত্যু।

ঘটনায় দুই প্রকার প্রতিভা প্রকাশিত হইতে পারে। এক প্রকার, অতি স্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহা সুন্দর রূপে বর্ণনায়। অন্য প্রকার, তাহার সহিত মূল গ্রন্থের সম্বন্ধ প্রকাশে। একটি, ঘটনার বর্ণনায়, আর একটি, ঘটনার উদ্দেশ্যে। আমরা একটি একটি করিয়া ঘটনা গুলি সমস্ত সমালোচনা করিব।

১। রোহিণীর উইল চুরি কিছু অসম্ভব ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। অত বড় লোকের ঘরে যে এইরূপ ভাবে চুরি হইতে পারে, তাহা পাড়াগাঁয়ের লোক ভিন্ন অন্যে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা হউক, একটু খানি যদি অবিশ্বাস যোগ্যও কিছু থাকে, ঘটনা-কৌশল দেখিলে তাহা বিস্মৃত হইতে হয়। বুড়া কৃষ্ণকান্তের আফিঙ্গ খাওয়াটা এই জন্যই হইয়াছিল।

এই ঘটনার অন্য দিক্‌টি বড় সুন্দর হইয়াছে। রোহিণী স্ত্রীলোক হইয়াও যে কারণে সাহসী হইয়া এরূপ কার্য্য করিতে আসিয়াছিল, তাহা বেশ সঙ্গত হইয়াছে।* রোহিণী বাল-বিধবা—যুবতী, আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণা। তাহার নিকট জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের জিনিস—স্বামী। হরলাল তাহাকে সেই সুখের জিনিস দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। হরলালকে সে পতিরূপে পাইবে, এ প্রলোভন তাহার নিকট অত্যজ্য। আবার এই ঘটনাটিতে রোহিণী-চরিত্রের মৌলিক ভাবটিও বেশ খুলিয়াছে। তাহার দুর্দ্দমনীয়া বাসনা, ইহা অপেক্ষা আর কিসে অধিকতর ব্যক্ত হইত? এই ঘটনাই আবার পরোক্ষভাবে গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আসক্তির অন্যতম কারণ

* এ সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণে যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণের ঘটনা অধিকতর সঙ্গত, সুতরাং সুন্দর।

—এই ঘটনা ধরিয়াই আবার গোবিন্দলালের নিকট সে তাহার চিত্তখানি খুলিয়া দেখাইতে পারিয়াছিল। রোহিণীর উইল চুরি তাহার জীবনের অন্যতর প্রধান ঘটনা। যে ঘটনার সহিত গ্রন্থের এতদূর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার কল্পনা প্রশংসনীয় নয় কি? উপন্যাস লিখিতে, এই গুলি বড় আবশ্যক।

২। রোহিণীর আসক্তিতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। অমন লালসাবতী রমণী গোবিন্দলালকে দেখিয়া আসক্তা হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, রোহিণী গোবিন্দলালকে ত আরও দেখিয়াছে, অন্য দিন ত এরূপ ঘটে নাই? তাই গ্রন্থকার কতকগুলি কৌশল গ্রহণ করিলেন। প্রথম, সেই কোকিল। তোমরা যাহাই বল না কেন, আমরা কোকিলের এ ক্ষমতাটুকু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কোকিলের স্বর যে স্বপ্নের মত কতকগুলি কথা মনের ভিতর জাগাইয়া দেয়, তাহা আমরা যেন অনুভব করিয়াছি। গ্রন্থকার এ ভাবটুকু অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কোকিলের ডাক শুনিলে মনে হয় যেন "কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবন-সর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কি যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।" এই বর্ণনাটি বড়ই সুন্দর। সাধে কোকিল আমাদিগের আর্য্যকবিগণকে এত মাতাইয়া তুলে নাই। অনন্য-কার্য্যব্যাপৃত মনে অতর্কিতরূপে কোকিলের ডাকে মানব মাত্রেরই মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় তবে কাহারও বা পবিত্র ভাবে, কাহারও বা অপবিত্র ভাবে। বাস্তবিক পক্ষে, চিন্তাটি পবিত্র ভাবেই উৎপন্ন হয়। যে আকাঙ্ক্ষাটি মনে উদ্রেক হয়, তাহা পার্থিব বিষয়ের নহে—কিন্তু কুলোকে তাহা পার্থিব বিষয়ে যুক্ত করিয়া সে আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে। ঐ সময়ে একটি আর্য্য ঋষি থাকিলেও, তাঁহার মনে ঐরূপই ভাব উঠিত, কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অর্থ, তাঁহার সৌন্দর্য্যের অর্থ, তাঁহার হারাণ রত্নের অর্থ, অন্যরূপ হইত। সে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, সে অনন্ত সৌন্দর্য্য, সে হারাণ রত্ন এ জগতের নহে। তাই বলিতেছিলাম—এ কোকিলের কথায় বড়ই কবিত্ব আছে। শুদ্ধ এইটুকু লিখিয়া এক জন কবি নামে খ্যাত হইতে পারে। ইহা একটি খণ্ড কবিতা। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এরূপ খণ্ড

কবিতার অভাব নাই। দ্বিতীয়, সেই সময়ে সেই রূপ ভাবে গোবিন্দলালকে দেখা। রোহিণীর মন এখন উতলা হইয়া উঠিয়াছিল—জল-নিমগ্ন ব্যক্তির আকুলতার ন্যায়, ইহার মনে, প্রণয়-বাসনা পরিতৃপ্তির একটা আকুলতা উঠিতেছিল। এই সময়ে সে দেখিল 'সুনীল,নির্ম্মল অনন্ত গগণ—ইত্যাদি (৮০ পৃঃ দেখ) কি সুন্দর কবিত্ব! কাব্যাংশে এ স্থলটী যে কোনও কাব্যের যে কোন স্থলের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। সেই কলসী ভাসানেই বা কি সুন্দর কবিত্ব রহিয়াছে! আমরা বেশি বই পড়ি নাই সত্য কিন্তু যাহা পড়িয়াছি, এরূপ ভাষায় এরূপ ভাব-ঘটনার সম্বন্ধ বর্ণিত দেখি নাই। অন্য কারণ না থাকিলেও, রোহিণীর মত স্ত্রীলোকের গোবিন্দলালের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার স্বাভাবিকতা ইহাতেই দেখান হইত। তৃতীয়, সেই উইল চুরি—সেই "গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ"। এ সকল কথা আর অধিক বলিবার দরকার নাই। গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তি জন্মাইতে কবিবরের এতগুলি চেষ্টা করিতে হইয়াছিল!

৩। রোহিণীর জল-নিমজ্জন ঘটনা কবির আর একটি কাব্য-কৌশল। ঘটনাটি যেমন স্বাভাবিক, তেমনই আবার উদ্দেশ্য যুক্ত। রোহিণীকে যদি অমন করিয়া তাঁহারই জন্য জলনিমগ্না না দেখিতেন, যদি অমনি করিয়া তাহাকে না বাঁচাইতে হইত, তবে গোবিন্দলালের মন কখনই টলিত না। এ ঘটনাটিও মূল গ্রন্থের একটি অতি প্রধান ঘটনা। ইহার ফল গোবিন্দলাল চরিত্রে যাহা হইয়াছিল, তাহা আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি।

৪। গোবিন্দলালের কলঙ্ক রটনাটিতেও কবিত্ব আছে। এ কলঙ্ক কিরূপে প্রথম রটনা হয়, তাহা আমরা জানি না। ভ্রমর ক্ষীরি চাকরাণীর নিকটেই ইহা প্রথমে শুনিয়াছিল। এইরূপ কথা এইরূপ শ্রেণীর লোকেরই মুখে ভাল শোভে। তারপরে সে যেরূপ করিয়া ইহা মেয়ে মহলে প্রচারিত করিল, এইরূপ করিয়াই প্রায় এই সমস্ত কথা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া থাকে। তার পরে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"বিনোদিনী সুরধুনীর পর, রামী বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী * * * প্রভৃতি অনেকে আসিয়া, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল যে, তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বর্ষিয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরকে বলিল, 'আশ্চর্য্য কি? সেজ বাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে! রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না

ভুলিবেন কেন?' কেহ আদর করিয়া, কেহ চিবাইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে, ভ্রমরকে জানাইল যে, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

"গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—কালো কুৎসিতের এত সুখ?—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—দেবীদুর্ল্লভ স্বামী —লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, সম্বাদ দিতে আসিল, 'ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে'।" ইহার সৌন্দর্য্য কি আবার ব্যাখ্যা করিতে পারে? এরূপ ঘটনা ত আমরা জানি, কিন্তু এরূপ ভাষায়, এরূপ স্থলে, এরূপ করিয়া বর্ণনা করিতে পারি কি? আমাদিগের এইখানে পোপের কথা মনে পড়িল।

True wit is nature to advantage dresse'd,
What oft was thought, but ne'er so well expresse'd;
Something whose truth convinced at sight we find
What gives us back the image of our mind.

এই কলঙ্ক রটনাতেই ভ্রমরের চিত্র খুলিয়াছে—তাহার পতিপ্রেম খুলিয়াছে, তাহার হৃদয়ের অভিমানটুকু খুলিয়াছে। রোহিণীকে ভ্রমরের নিকটে পাঠানেও গ্রন্থকার বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছেন। রোহিণীকে ঐরূপ ভাবে না দেখিলে, কি ভ্রমর অমন করিয়া স্বামীর নিকট পত্র লিখিতে পারে?

৫। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ঘটনাটি, উইলের ধারা খাটাইবার জন্য। পুস্তকখানির নাম "কৃষ্ণকান্তের উইল" দেওয়া হইয়াছে, সেই উইলের সহিত ভ্রমর-গোবিন্দলালের জীবনের এক সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে, তাই কৃষ্ণকান্তের ঐ সময়ে মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যু বর্ণনা স্বাভাবিক—ইহার উদ্দেশ্যও অসার নহে।

৬। গোবিন্দলালকে অনুসন্ধান করার ঘটনায় গ্রন্থকার ডিটেক্‌টিভ্ পুলিসের অনুসন্ধানী বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনাটি বেশ মানাইয়াছে। ইহাতেও কম প্রশংসার বিষয় নাই।

৭। রোহিণীর মৃত্যু যাহাতে ঘটিল, তাহা অতি সুন্দর দেখান হইয়াছে। এই কারণেই প্রায় দুশ্চারিণীদিগের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহাতে রোহিণীর ভালবাসার প্রকৃতি ও গোবিন্দলালের ভালবাসার গঠন, সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। ভ্রমরের মৃত্যু বর্ণনা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৯। গোবিন্দলালের মৃত্যুতেও কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। তাঁহার উন্মত্ততায়, তাঁহার ঐরূপ করিয়া বারুণী পুকুরের জলে ডুবিয়া মরায়, গ্রন্থকারের আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

দেখিলে পাঠক, কৃষ্ণকান্তের উইল খানি? দেখিলে ইহার উদ্দেশ্য, দেখিলে সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহার চরিত্র গুলির বিকাশ? দেখিলে, সেই চরিত্রগুলির বিকাশার্থ ইহার ঘটনার সমাবেশ? দেখিলে সেই ঘটনা বর্ণনার্থ ইহার ভাষার রচনা? দেখিলে ইহার মন্তব্যগুলি? একমাত্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখিতে পারিলে, আমরা বঙ্কিম বাবুর সমকক্ষ বলিয়া মনে ভাবিতে পারিতাম। আর কি বলিব?

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ভ্রমর।*

এখন ভারতে যদি গৌরব করিবার কোন জিনিস থাকে, তবে তাহা রমণী-হৃদয়। আর্য্যরমণী ভারতের কেন, সমস্ত জগতের—সমগ্র সৃষ্টির গৌরবের বস্তু। নারীজাতি যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, তাহা ভারতবাসী যেমন সহজে বুঝিতে পারে, এরূপ আর কেহই নহে। চিতোর—রাজপুতনার কথা ছাড়িয়া দেও, আজিও বঙ্গগৃহে সতী, সাবিত্রীর অভাব নাই। অভাগিনী বাঙ্গালা এ সম্বন্ধে ভারত-ক্রোড়ে স্থান পাইবার অযোগ্যা নহে।

আজ যে রমণী-মূর্ত্তিটি শিরোদেশে স্থাপনা করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, বুঝি ইহাই বাঙ্গালার শেষ 'আপনার ধন'। প্রভাতোন্মুখ শর্ব্বরীর ন্যায় বাঙ্গালার এক একটি তারকা যেন নীরবে শূন্য-ক্রোড়ে মিলাইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দিনে, ইহার স্নিগ্ধ, স্তিমিত, নেত্রমুগ্ধকর আলোক আর আমাদিগের নেত্রগোচর হইতেছে না। অজ্ঞানে

* গোবিন্দলাল ও রোহিণী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করি; কিন্তু ভ্রমর সম্বন্ধে আরও কিছু লেখা উচিত বোধ করিলাম।
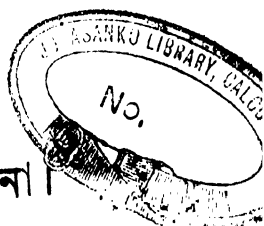
অনাদরে, সুরবালাগণ যেন ম্লানমুখী হইয়া ধীরে ধীরে অন্তর্দ্ধান হইতেছেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি কেবল বঙ্গদেশই জয় করিয়াছিল—আজ ইংরাজ-রাজ আমাদিগের রুচি পর্য্যন্ত জয় করিতেছে! এ দুঃখ কি বলিবার?

ভ্রমর—দুঃখিনী, আর্য্যরমণী ভ্রমর—এ রুচিরগ্নির প্রধান আহুতি। একটি সরলা আর্য্যবালাকে আধুনিক পাশ্চাত্য সৎশিক্ষায় ভূষিতা করিলে, যেরূপ হইয়া থাকে, গোবিন্দলালের শিক্ষার ফলে ভ্রমর তাহাই হইয়াছিল। ভ্রমরের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, "স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র উপাস্য দেবতা, 'সান্ত অনন্ত', স্বামীই ইহকাল, স্বামীই পরকাল," ভ্রমর বাহিরে শিক্ষা করিতেছে, "ধর্ম্ম স্বামী হইতেও বড়—স্বামী ধর্ম্মবিরোধী হইলে অপরিত্যজ্য নহে"। ভ্রমরের অন্তঃকরণে পূর্ণমাত্রায় সাবিত্রীর উপকরণ বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু ভ্রমরের শিক্ষায় আবার পূর্ণ মাত্রায় পাশ্চাত্য সাম্য ও সাধুতা বর্ত্তমান দেখিতে পাই। এ দুইয়ের সংমিশ্রণ বুঝি 'মধু সর্পির' ন্যায়, তাই ভ্রমরেও তাহা শুভফল উৎপাদন করিতে পারিল না। আর্য্যরমণী ভ্রমর তাই সে শিক্ষার অত্যাচারে এ জগত হইতে পলায়ন করিল। সূর্য্যমুখীর পরে ভ্রমরকেও আমরা খাঁটি আর্য্যরমণী বলিয়া চিনিলাম—কিন্তু ইহার পরে যে কি হইবে, কে বলিতে পারে? যে দিন শিক্ষা হৃদয়কে পরাস্ত করিতে পারিবে, সেই দিনই এ লক্ষ্মীধাম ভারতভূমি লক্ষ্মীছাড়া হইবে। তাই বলিতেছিলাম, বুঝি ভ্রমর এ দেশের শেষ 'আপনার ধন'। এ ভ্রমরে শিক্ষার আর একটু প্রভাব বিস্তার করিলেই আর তাহাকে আর্য্যরমণী বলিয়া চিনিতে পারিব না।

ভ্রমরের স্থূল পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। ঐ যে বালিকা মূর্ত্তিটি হাসিতে হাসিতে স্বামিপ্রেমে বিভোর হইয়া স্বামীর সহিত, বালিকার ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে—সংসার ভুলিয়া, জ্ঞান ভুলিয়া, আপনার উদ্বেলিত তরল হৃদয়টি প্রেমের মধুর জ্যোতিতে বিকীর্ণ করিয়া স্বামীর জ্ঞান-অভিমান-পূর্ণ পুরুষোচিত কঠিন হৃদয়টিকে আস্তে আস্তে দ্রবিত করিতেছে, অহঙ্কারকে আত্মবিস্মৃতিময় করিয়া তুলিতেছে, উহার নামই 'ভ্রমর'। ইহাতে যদি সম্যক না চিনিয়া থাক, ঐ দেখ, ঐ যে একটি কোমলপ্রাণা বালিকা প্রতিবাসিনীবর্গের মুখে স্বামীর কলঙ্ক-কথা শুনিয়া সন্দেহ-বিষে জর্জ্জরিতা হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বলিতেছে 'হে গুরো! শিক্ষক! ধর্ম্মজ্ঞ! আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! হে সন্দেহভঞ্জন! প্রাণাধিক! আজি

কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিব, এ কথা কি সত্য? আজি আমার সন্দেহ-ভঞ্জন কে করিবে? ইত্যাদি" উহার নামই 'ভ্রমর'। ইহাতেও যদি তাহাকে না চিনিয়া থাক, তবে ঐ দেখ ঐ যে শীর্ণশরীরা, স্বামিবিরহবিধুরা কামিনীটী রুগ্নশয্যায় শায়িত রহিয়াছে, ঐ যে কামিনীটি স্বামীর চিন্তায় দুর্দ্দান্ত যক্ষারোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করতঃ প্রফুল্লচিত্তে প্রাণত্যাগ করিতেছে, উহাই আমাদিগের সেই 'ভ্রমর'। ভ্রমরের আর অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

ভ্রমরের স্বামিপ্রেম বলিয়া উঠিতে পারি না। আমরা তাহা বর্ণনা করিতেও এখানে বসি নাই। আমাদিগের উদ্দেশ্য, আমাদিগের সমাজের সহিত ভ্রমরের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা; আমরা এখন তাহাই করিব।

বাল্যকাল হইতে স্বামীর সহবাসে থাকিয়া স্বামীর শিক্ষাফলে ভ্রমর সুসংস্কৃতা কাঞ্চনখণ্ডের ন্যায় চতুর্দ্দিকে শোভা বিকীর্ণ করিতেছিল। যেন একটি সুবর্ণ প্রদীপ বিদেশীয় মনোহর কাচাবরণ মধ্যস্থ হইয়া অপূর্ব্ব মিশ্রিত জ্যোতিতে আমাদিগের নয়ন জুড়াইতেছিল। স্বামীর সহিত ভ্রমরের সেই-রূপ ভাবে আবদার ও ক্রীড়া সেই বিদেশীয় আবরণের অঙ্গ বিশেষ, আর তাহার ভক্তিমাখা ভালবাসা, পতিময় প্রাণ সেই সুবর্ণ প্রদীপ।

ভ্রমরকে ভাবিতে সূর্য্যমুখীকে মনে পড়ে। কিন্তু সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর এক নহে। সূর্য্যমুখীর নিকট স্বামিসেবা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম ছিল না। স্বামিসুখ ভিন্ন তাহার জীবনের অন্য লক্ষ ছিল না—স্বামীই তাহার ইহকাল, স্বামীই তাহার পরকাল। ভ্রমর স্বামীর সুখই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করিত না—অথবা স্বামী যাহাতে সুখী মনে করিতেন ভ্রমর ঠিক তাহাতে তাঁহার সুখ মনে করিত না। স্বামীর ধর্ম্ম, স্বামীর সুনাম, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই তাহার নিকট সমধিক আদরের জিনিস। দুইটিই সুন্দর! দুইটিই পূর্ণ বিকশিত, সুতরাং দুইটিই সুন্দর! স্বামীর প্রত্যেক কল্পিত সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জনও সুন্দর, আবার স্বামীর প্রকৃত সুখের উপাদান—তাঁহার ধর্ম্মের দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখাও সুন্দর! সহজে কে বলিবে, সূর্য্যমুখী সুন্দর, না, ভ্রমর সুন্দর? আমাদিগের সমাজে ভ্রমরই ভাল শোভে, না, সূর্য্যমুখীই ভাল শোভে? সহজে ইহা বলা যায় না।

আমরা এসম্বন্ধে অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে, ভ্রমর সূর্য্যমুখীর তুলনায় কিছু ক্ষীণপ্রভ। ইহার কারণ এই যে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে ভ্রমরের হৃদয়-

খানিতে একটি কলঙ্ক পরিদৃষ্ট হয়। হ্যাঁ, কলঙ্ক বই কি?—যাহার বিদ্য-মানতা ভ্রমরের সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর হৃদয়-দেশে ভাল শোভিল না, প্রত্যুত কুৎসিতই দেখাইল, তাহাকে কলঙ্ক বলিব না তবে কি বলিব? সেই কলঙ্কটি ভ্রমরের ধর্ম্মাভিমান, প্রেমাভিমান—বা সম্যক্ আত্মগুণবোধ। যখন ভ্রমর বিশ্বাস করিল যে, গোবিন্দলাল ধর্ম্মপথস্খলিত হইয়াছেন, তাহার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, তখন ভ্রমর স্বামীর নিকট পত্র লিখিল "যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য ইত্যাদি"। আবার যখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিবার পরে ভ্রমরকে পত্র লিখিলেন, ভ্রমর তদুত্তরে 'সেবিকা' পাঠ লিখিল না। ইহা এক প্রকার ধর্ম্মাভিমান বা ধর্ম্মের গোঁড়ামি। ইহাই সেই অন্যথানির্ম্মল ভ্রমর-চরিত্রে একমাত্র সুতরাং অতি উজ্জ্বল কলঙ্ক।

এ কথা যে অনেকের মতের সহিত মিলিবে না তাহা জানি। এক দল লোকে বলিবেন "বেশ ত, ইহাতে ক্ষতি কি? সদ্‌গুণ দেখিলে ভক্তি করা উচিত বটে, কিন্তু স্বামীকে পরদারনিরত দেখিলেও কি তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে? ইহা হিন্দুদিগের একটি ভয়ানক কুসংস্কার।" আমরা দেখাইতে চাহি যে এটি কুসংস্কার নহে—অতি সুন্দর সংস্কার। হিন্দুদিগের নিকট 'পাপ' ও 'পাপী' এক কথা নহে। পাপকে ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিতে নাই। পাপীকে যে ঘৃণা করে, সে ধর্ম্মাভিমানী। তাহার মনে মনে ধার্ম্মিক বলিয়া একটা অহঙ্কার আছে। এইটি আমাদিগের মতে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ভ্রমর যখন স্বামীকে ভক্তির অযোগ্য পাত্র মনে করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তখন সে তাহার স্বামীকে তদপেক্ষা নীচ মনে করিয়াছিল। অন্যকে নীচচক্ষে দেখিয়া আপনাকে মহত্তর ভাবা কি ভাল? কি জানি, 'ভিন্ন রুচির্হিঃ লোকঃ, ইহার পর ভ্রমরের আরও এক কারণে গোবিন্দলালের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত ছিল—যে কারণে জন্মদাতা পিতা অসৎ হইলেও পুত্রের নিকট সর্ব্বদা ভক্তির পাত্র। গোবিন্দলাল ভ্রমরের গুরু। স্বামীমাত্রই এ অর্থে স্ত্রীর চিরভক্তির পাত্র।

যাহা বলা হইল,তাহা বিষয়টির মূল সম্বন্ধে। ফল সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। ভক্তি অপাত্রে ন্যস্ত হইলেও তাহা নিষ্ফলা যায় না। ভালবাসার ন্যায় ইহাও জগৎব্যাপী হওয়া উচিত। এরূপ অবস্থায় স্বামী যে স্ত্রীর কত দূর ভক্তির পাত্র, তাহা বলা যায় না। বিশেষ, যে সমাজে স্ত্রীর সকল

শিক্ষারই গুরু স্বামী, যে সমাজে স্বামীর সহিত স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, সে সমাজে স্ত্রীর স্বামিভক্তি একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় জিনিস। যে পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত না হইবে, যে পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে অনুপাত এই রূপই থাকিবে, যে পর্য্যন্ত আইনের সাহায্যে স্ত্রী স্বামী হইতে বিচ্ছিন্না না হইতে পারিবেন—অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ এ সম্বন্ধে হিন্দুই থাকিবেন, স্ত্রীলোকের স্বামিভক্তি না থাকিলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে। তবে, হিন্দুসমাজ যখন উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, তখন ইহা মঙ্গলকর হইলেও হইতে পারে; কারণ, বিষ সুস্থশরীরে প্রাণহানিকর হইলেও, অনেক ব্যারামের ঔষধও বটে।

আর যদি তর্কে পরাস্ত হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে ভ্রমরই বাস্তবিক আদর্শ রমণী, ভ্রমরের ধর্ম্মাভিমান ধর্ম্মের একটা অপরিহার্য্য পরিণাম; বলিব, ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া তাহার শোভা সম্পাদন করুন—এখানে সূর্য্যমুখীকেই আমরা চাহি। বিদ্যুৎ দেখিতেই ভাল—দয়াহীন ন্যায়পরতা শুনিতেই ভাল। ইহার সহিত সংস্পর্শ আমরা চাহি না। ভ্রমরকে বরং দূরে রাখিয়া পূজা করিব। সকল জিনিসেরই দেশ, কাল, পাত্র ভেদে আদরের তারতম্য হইয়া থাকে। আমাদিগের এ দেশে তাই ভ্রমর অপেক্ষা সূর্য্যমুখীরই আদর অধিক হওয়া উচিত। আমাদিগের সাবধান হইয়া দেখা উচিত যেন সূর্য্যমুখীগণ ভ্রমর না হইতে পারেন। কিন্তু ইহা কি স্বার্থপরতা? সঙ্কীর্ণতা? কে বলিবে?

২। কৃষ্ণকান্তের উইল।

এক একটি করিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' প্রধান চরিত্রগুলি আমরা যথাসাধ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি—এখন তৎসম্বন্ধে আমাদিগের গুটিকতক কথা বলিতে হইবে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিম বাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মধ্যেও উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। এইরূপ উপকরণ লইয়া, অতি অল্প উপন্যাসই তিনি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধ নাই, বিগ্রহ নাই, আশ্চর্য্য কোন ঘটনাও নাই। ইহাতে আছে কেবল কয়েকটি চরিত্র ও তাহা স্ফূর্ত্তি পাইবার জন্য কতকগুলি সাধারণ ঘটনা। বঙ্কিম বাবু এতৎপূর্ব্বে ভাবপ্রধান এরূপ একখানিও উপন্যাস লেখেন নাই। বিষবৃক্ষেও ভাব ছাড়া কতকগুলি কৌতুহল উদ্দীপনকারী সুতরাং মনোহর ঘটনার সন্নিবেশ আছে। ইহার পরেও

এখন পর্য্যন্ত এ রকমের উপন্যাস বাহির হয় নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' ঘটনাগুলি অতি সাধারণ—তাহা সচরাচর ঘটিতে দেখা যায়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলের' আর একটি প্রধান প্রশংসা এই যে, বর্ত্তমান সমাজের ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী—উপযোগী ও উপকারী। যাঁহারা স্থূল বিষয় লইয়া নবেল লিখিতে বসেন, বঙ্কিম বাবু আমাদিগের সেই শ্রেণীভুক্ত নহেন। যে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্মভাবে আমাদিগের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের জীবন-কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে, বঙ্কিম বাবু তাহাই বিকশিতরূপে পাঠকবর্গকে দেখাইয়া থাকেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের', গোবিন্দলাল ও ভ্রমরে যে এখনকার কত যুবক-যুবতীর অন্তর-রহস্য সমালোচিত হইয়াছে, যুক্তির সহিত ভাবিফল দেখাইয়া তাহার দোষগুলি কিরূপ সুন্দর রূপে দেখান হইয়াছে, তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' পাঠকবর্গের নিকটে অবিদিত নাই। গোবিন্দলালের অধঃপতনের সূক্ষ্ম অঙ্কুরটুকু, আমাদিগের প্রায় প্রত্যেকের হৃদয়েই অবস্থিত রহিয়াছে—ভ্রমর চরিত্রের দোষভাগও সমাজ-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদিগের বোধ হয়, যদি আমরা ভাল করিয়া এই দুইটি চরিত্র বুঝিয়া হৃদয়স্থ করিয়া রাখিতে পারি—না বুঝিয়া ঘটনার সন্তাড়নে আমাদিগকে কখনই ঐ প্রকার অধঃপাতিত হইতে হইবে না। অনেক সময়ে আমরা একটি ভাবকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শেষে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পড়ি যে, তখন আর সে দোষ সংশোধনের উপায় থাকে না। আমরা তখন অবস্থার সম্যক্ দাস হইয়া, মানব মনের বিচারশক্তি জনিত উৎকৃষ্ট পথাবলম্বনের উপায় রহিত হইয়া পশুবৎ বিনষ্ট হইয়া থাকি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর গোবিন্দলাল সদেচ্ছা ও জ্ঞানযুক্ত হইয়াও অন্তর-বিশ্লেষণের ক্ষমতা না থাকা প্রযুক্ত ঐরূপে অধঃপতিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দলাল এখন শত সহস্র যুবকের শিক্ষক হইতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

চন্দ্রশেখর।

ইতিবৃত্ত।

"চন্দ্রশেখর" প্রথমে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১২৮১ সনে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময়ে ইহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত, অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং কোন কোন স্থান পুনঃ লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু চারি খানি নবেল লিখিয়াছিলেন।

১২৯০ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। এখন পর্য্যন্ত ইহা তৃতীয়বার মুদ্রিত হয় নাই। সাধারণ্যে পুস্তক খানির বেশ আদর আছে। বাঙ্গালার পাঠকমাত্রেই চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের কথা অবগত আছেন। অন্যের সহিত তুলনায় ইহাঁরা আদর্শ-চিত্র মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন।

ইহার ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না। যে অর্থে Henry IV. প্রভৃতি গ্রন্থকে ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া থাকে, সে অর্থে বঙ্কিমবাবুর প্রায় উপন্যাসই ঐতিহাসিক নহে। নবেলে ঐতিহাসিক ঘটনা থাকিলেই তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় না। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "সয়ের মতাক্ষরীন্ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্ল্লভ"।

পুস্তকখানির বর্ত্তমান মূল্য এক টাকা।

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।*

দুইটি বিভিন্ন পরিবার লইয়া "চন্দ্রশেখর"-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি নবাব মীরকাসেমের—অন্যটি দরিদ্র চন্দ্রশেখরের। আর্য্যদেশের নিয়মানুসারে এ গৃহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চন্দ্রশেখর দরিদ্র হইয়াও কর্ত্তৃস্বরূপ, নবাব মীরকাসেম কেবল তাঁহারই গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। আমরা এই গৃহে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাযোগ্য কেবল তিনটিই প্রধান চরিত্র দেখিতে পাই। (১) চন্দ্রশেখর (২) শৈবলিনী (৩) প্রতাপ।

১। চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখর বঙ্কিমবাবুর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হৃদয়ের মহান্ ভাব, চিত্তের ঔদার্য্য, প্রণয়ের প্রগাঢ়তা, এ চিত্রে অতি মনোহর রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত সমানক্ষেত্রে রাখিয়া প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষমতাশালী কবি যতদূর মহৎ ও উন্নত চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন, চন্দ্রশেখরের চরিত্র ততদূরই উন্নত ও মহৎ হইয়াছে। আর একটু রঙ্ ফলাইতে গেলেই যেন, ইহা আর এরূপ মনোহর হইতে পারিত না—যেন চিত্রটির স্বাভাবিকতা (Reality) সম্যক্ বিনষ্ট হইয়া যাইত, এবং আমরা ইহাকে অলৌকিক বলিয়া বোধ করিতে বাধ্য হইতাম। তবে কি চন্দ্রশেখর কাল্পনিক আদর্শ-চরিত্র নহে? অবশ্যই কাল্পনিক চরিত্র বটে কিন্তু কাল্পনিক চিত্রমধ্যেও আবার শ্রেণী-বিভাগ রহিয়াছে, ইহার মধ্যেও আবার স্বাভাবিকতা ও কাল্পনিকতা আছে। একশ্রেণীর চরিত্র দেখিলে, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়, কাজেই সেইগুলি আমাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সম্যক্ সমর্থ হয়না; আর এক শ্রেণীর চরিত্র কাল্পনিক হইলেও, তাহা দেখিয়া স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। আমাদিগের বিবেচনায়, যিনি যে পরিমাণে এই শেষোক্ত প্রকারের চরিত্র সৃজন করিতে পরেন—যাঁহার কাল্পনিক চিত্রে যতদূর স্বাভাবিকতার চিহ্ন থাকে, তিনি সেই পরিমাণে প্রতিভাশালী ও চরিত্রসৃজনে ক্ষমতাপন্ন। স্বাভাবিক চরিত্র চিত্রনে যে একেবারেই নৈপুণ্য

---

* 'চন্দ্রশেখর' এ শৈবলিনী-চরিত্র ভিন্ন অন্য সকল চরিত্রই সমধিক উজ্জ্বল—সুস্পষ্ট। চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, দলনী, রমানন্দের মহত্ত্ব পাঠকবর্গের মনে সহজেই অঙ্কিত হইয়া যায়, সুতরাং তাহা বিশেষ বিস্তৃত করিয়া ব্যাখ্যা না করিলেও চলিতে পারে।

প্রকাশিত হইতে পারে না আমরা এ কথা বলিতেছি না, জীবনচরিত লিখিতে গিয়াও চিত্রনৈপুণ্য দেখান যাইতে পারে, কিন্তু সে চাতুর্য্য ও সে কৌশলে, আর আমরা যাহার কথা বলিলাম সে কৌশলে,—প্রভেদ বিস্তর। একের প্রশংসা নির্ব্বাচনে,—অন্যের প্রশংসা কল্পনায়। একের প্রশংসা প্রকৃতিরাজ্য হইতে মনোহর ও অভীষ্টফলোৎপাদক চিত্রগুলি নির্ব্বাচন করিয়া, তাহাই অবিকৃতভাবে সাধারণ্যে উপস্থিত করায়; অন্যের প্রশংসা প্রকৃতিরাজ্য হইতে কৃতকগুলি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট রঙ্ বাছিয়া লইয়া তদ্দ্বারা একটি অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত করায়। তাঁহার চিত্রের রঙ্গুলি সকলই আমাদিগের পরিচিত, কিন্তু সেগুলির মিশ্রণ আমরা কোথায়ও দেখিতে পাইনা এবং তাহা অতি উৎকর্ষরূপেও জগতে বিরাজ করে না। আমাদিগের বর্ণনীয় চন্দ্রশেখরও এই শ্রেণীর চরিত্র। চন্দ্রশেখরের চরিত্রে মানবীয় উদারতা, মহত্ত্ব ও ক্ষমাশীলতার পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই একটি মানবীয় দুর্ব্বলতা রাখিয়া দিয়া; কতকগুলি স্বাভাবিক রঙ্কে অতি সুন্দর করিয়া মার্জ্জিত করিয়া, আবার কতকগুলি স্বাভাবিক রঙ্ অমার্জ্জিতাবস্থায় রাখিয়া দিয়া, কবিবর একটি স্বাভাবিক অথচ কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়াছেন। চন্দ্রশেখর কাল্পনিক হইয়াও স্বাভাবিক। ইহাই কবির কৌশল, ইহাই শ্রেষ্ঠ কবির আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয়।

চন্দ্রশেখর আদর্শ-চরিত্র। কিন্তু আদর্শ-চরিত্র কিছু এক রকমের থাকে না, অথবা সকল বিষয়ের আদর্শ এক ব্যক্তিতে দেখা যায় না। জ্ঞান, ভক্তি, ও কর্ম্ম এক ব্যক্তিতে সমান মাত্রায় দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। চন্দ্রশেখর আমাদিগের এ দেশীয় কবির কল্পিত আদর্শ-চিত্র। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় তিনি সম্পূর্ণ সংসার-বন্ধন বিমুক্তও নহেন, আবার সামান্য লোকের ন্যায় তিনি সংসার মায়াতেই সম্পূর্ণ নিবদ্ধ নহেন। তিনি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরমোৎকর্ষ। বঙ্কিম বাবু এই চিত্রটিকে কিরূপ করিয়া পরিচিত করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার পরিচয় দিতেছি। আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রিয় বাঙ্গালি কবির 'চন্দ্রশেখর' এইরূপই হওয়া উচিত।

চন্দ্রশেখর জ্ঞান-পিপাসু। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি আমাদিগকে এ জ্ঞানতৃষা সুন্দররূপে দেখাইবার জন্য বলিয়া লইলেন,—

"তিনি গৃহস্থ অথচ সংসারী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই। দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ

ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। * * * চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।" চন্দ্রশেখর অবশেষে বিবাহ করিলেন। কিন্তু তাহা জ্ঞানতৃষ্ণা নির্ব্বিঘ্নে পরিতৃপ্ত হইবে বলিয়া।

চন্দ্রশেখর স্বীয় জীবনের একজন কঠোর সমালোচক। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তিনি সর্ব্বদাই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ড ধরিয়া আছেন। তিনি শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অনুতপ্ত। চন্দ্রশেখরকে আমরা একদিন ভাবিতে দেখিয়াছি—

"হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলন-ব্যস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেম? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত। আমি কি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া, রমণীমুখপদ্ম কি ইহজন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধা শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?" আবার শৈবলিনী যখন উন্মত্তাবস্থায় যোগবলে চন্দ্রশেখরের নিকট কহিল, 'এক বোঁটায় অমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিলে কেন? "চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না।"

চন্দ্রশেখর শান্তিপ্রিয়—তিনি ক্ষমাগুণের আধার; তাঁহার নিকট শত্রু মিত্র ভেদ নাই। প্রতিহিংসা তাঁহার নিকট নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। চতুর প্রতাপ

যখন 'ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম" বলিয়া চন্দ্রশেখরকে যুদ্ধে গমনের একটি কারণ দেখাইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, চন্দ্রশেখর বলিলেন,—

"ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে, যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।

দেখিলে উদারতা! দেখিলে ক্ষমাগুণ! আর্য্যদিগের কবির কল্পনাতেই এইরূপ চিত্র সৃষ্ট হইতে পারে। খৃষ্টিয়ান হইলেই হয় না, চিরকালের মনের ভাব দুই এক দিনের শিক্ষা বা দুই এক জনের দৃষ্টান্তে অপসারিত হয় না। আর্য্যদেশে খৃষ্টের অভাব নাই, আর্য্যদেশের শিক্ষা পূর্ব্বাবধিই অন্যরূপ, তাই এরূপ ক্ষমাগুণের কথা কেবল সেই খানেই সম্ভব পায়। রক্তপিপাসু, প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন জাতির কবি এই স্থলটি কিরূপ করিয়া তুলিতেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

আরও একটি কথা এখানে না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য চন্দ্রশেখর প্রথমে দারপরিগ্রহ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই এবং যে জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই আবার তাঁহার দারপরিগ্রহণার্থ ইচ্ছা হইল, সে জ্ঞানের ফল এইরূপ। বোধ হয়, ইহা দেখিলে, উনবিংশ শতাব্দীর 'সুশিক্ষিত'—ইংরাজি-চালে-শিক্ষিত যুবকগণও চন্দ্রশেখরের জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিবাহ করার অপরাধটি মার্জ্জনা করিবেন।

তাঁহার চন্দ্রশেখর জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক। তিনি "তত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু।" জ্ঞান ও ভক্তি দুইই তাঁহাতে দেখিতে পাই। চন্দ্রশেখর গৃহ প্রত্যাগমনের সময় ভাবিতে লাগিলেন—

"কেন, বিদেশ হইতে আগমন কালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন আহার নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হইব? এবয়সে আমাকে গুরুতর মোহবন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এইজন্য আমার এ আহ্লাদ? লোকে বলে সকলই মায়া! কিছুই মায়া নয়, তাহারাই মায়ার মায়ায় মুগ্ধ। ভগবান্ বলিয়াছেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমি। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য —কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ। আমার

যে তন্নী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্ল কমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতে ইচ্ছা করে না—যদি অনন্ত কাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।”

এই স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে কঠোর সমালোচক রূপে স্বীয় অন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিতে আমরা দেখিতে পাই। ভগবান বলিয়াছেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমি। যদি তাই, তবে তিনি (চন্দ্রশেখর) তাঁহার তন্নীদার অপেক্ষা শৈবলিনীর কথা এত ভাবিতেছেন কেন? কথাটা তাঁহাকে কিছু গোলে ফেলিল। তাঁহার নিকট যেন বোধ হইল, যে, ইহা না করিয়া পারা যায় না। সর্ব্বভূতে সমানজ্ঞান কোন কাজের কথা নহে। তাড়াতাড়ি আবার চন্দ্রশেখর বলিয়া বসিলেন—“ভগদ্বাক্যে আমি অশ্রদ্ধা করি না—কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইয়াছি।” ধন্য চন্দ্রশেখর! ধন্য আর্য্যদেশ! এই খানেই এই চরিত্র কল্পিত হইতে পারে। এত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জীবনের কার্য্যগুলি আর কোথায় কে দেখিতে পারে? যতই আমাদিগের স্থূল বিষয়ের জন্য ভাবনা কমিয়া আইসে, ততই আমরা সূক্ষ্মবিষয়ের জন্য ভাবিতে অগ্রসর হই। লোকের অন্তঃকরণ যে পরিমাণে উন্নত হইবে, লোকের স্বভাব যে পরিমাণে মার্জ্জিত হইবে, এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁহার ততই দৃষ্টি পড়িবে। আমার নিকট একটি নরহত্যায় যে পাপ ও গ্লানি বোধ হইবে, অপেক্ষাকৃত উন্নতমনা একটি ধার্ম্মিক লোকের নিকট একটি কীট মাড়াইতেও সেই রূপ পাপ ও সেইরূপ গ্লানি বোধ হইবে। চন্দ্রশেখর যে কত বড় ধার্ম্মিক, চন্দ্রশেখর যে তাঁহার জীবনের কার্য্য কিরূপ তুলিতে মাপিয়া লয়েন, আত্মার প্রতি তাঁহার কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কবি এই উক্তিতেই তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর পরোপকারী—তিনি আপনার জীবন শঙ্কটাপন্ন করিয়াও এক দিন প্রতাপের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুভক্তি অসীম—তিনি রমানন্দ স্বামীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত শিষ্য। ইহাঁর নিকটেই তিনি পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখরের প্রণয় অপরিসীম। অন্তঃসলিলবাহিনী ফল্গু নদীর ন্যায়

তাহা আপন মনেই বহিয়া যাইতেছিল; বাহিরে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাতে জোয়ার ভাটা ছিল না, ঈষৎ বায়ু বহিলেই সেখানে তরঙ্গ উঠিত না। তাহা নিবাত নিষ্কম্প প্রশান্ত সাগরের ন্যায় স্থির, গভীর ও মহান্ ভাবোদ্দীপক। যে দিন কবি আমাদিগকে বাহিরের বালুকারাশি বিচ্ছিন্ন করাইয়া তাঁহার সেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে দিলেন, সেই দিনই আমরা সে স্নেহরাশির অপরিমেয়তা ও প্রগাঢ়তা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু যতক্ষণ না সে বালুকারাশি ঘটনাচক্রে স্থানচ্যুত হইল, ততক্ষণ তাহা প্রচ্ছন্ন, অতি প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে লুক্কায়িত ছিল, বুঝি তাহা চন্দ্রশেখরও প্রথমে সম্যক্ জানিয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার চন্দ্রশেখরের এ ভাবটি যখন বাহিরে প্রকাশিত করিলেন, তখনও আমরা তাঁহার কৌশল দেখিয়া মোহিত হইলাম।

শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সুন্দরী তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাগত হন নাই, চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সকল শুনিলেন। "তখন, চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয়, গ্রন্থগুলি একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণ মধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোন খানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকল গুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

"অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্ একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহু যত্নে সংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত, সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

"রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।"

আমরা ইহা পড়িয়াই দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলাম, চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে কি আছে। এইখানেই আমরা কবির সেই দুই এক কথায় চন্দ্রশেখরের অপূর্ব্ব প্রণয় বর্ণনার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। সেই ভালবাসা **"সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয় অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর"** যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলাম। ইহা দ্বারা চন্দ্রশেখরের প্রগাঢ় প্রণয় যেরূপ দেখান হইয়াছে, শত পাতা লিখিয়া মরিলেও সেরূপ হইত না। শিল্পীর এই ত এক প্রধান গুণ। ঘটনাতেই, কার্য্যেতেই তাঁহার চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ হয়। সেই পুঁথি পোড়ান, সেই শালগ্রাম-শিলা বিতরণ, সেরূপ করিয়া গৃহত্যাগী হওন, ইহাতে চন্দ্রশেখরের হৃদয়খানি বড়ই খুলিয়াছে। এইখানেই তাঁহাকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় এবং এইখানেই তাঁহার দেবভাব, মহত্ত্ব ও প্রণয়ের প্রগাঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, এবং সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীকে একবার বলিতে ইচ্ছা হয়—

"জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা আর কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কিনা, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কিনা, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাংতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ গড়িয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভাল বাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে।"

চন্দ্রশেখরের এই প্রণয় যে কিরূপে শৈবলিনী-বিচ্ছেদের পরে জগৎ ব্যাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহা পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহা শুদ্ধ চন্দ্রশেখরের হৃদয়স্থ পরহিতব্রতের প্রবর্ত্তকমাত্র, তাহার উৎপত্তি-কারণ নহে। তবে এই প্রণয় সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে,—সেটি এই। এ প্রণয় যতই কেন প্রগাঢ় বা প্রবল থাকুক না, ধর্ম্মবীর চন্দ্রশেখরকে কিছুতেই ধর্ম্মপথস্খলিত করিতে পারিল না। প্রণয়ের প্রাবল্য আমরা শৈবলিনীতেও দেখিয়াছি, তাহা শৈবলিনীকে 'মোহময়ী করিয়া ফেলিয়া-

ছিল; কিন্তু চন্দ্রশেখরের প্রণয় প্রবল হইলেও তাঁহার প্রবলতর কর্ত্তব্যজ্ঞান ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। চন্দ্রশেখরের ধর্ম্মে যে কতদূর বিশ্বাস ছিল তাহাও ইহাতে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রশেখর অত্যন্ত হিন্দু—শৈবলিনী তাঁহার গৃহ হইতে যে কারণেই হউক ফষ্টরের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিল—শৈবলিনী তাঁহার প্রাণের সারভূত হইলেও, তিনি তাহাকে হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন গ্রহণ করিতে পারিলেন না। আবার তাহার কার্য্যতঃ সতীত্ব সম্বন্ধে ও ম্লেচ্ছান্ন-ভোজন প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ যখন দূরীকৃত হইল তখন তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। শৈবলিনীর ধর্ম্মতঃ প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে চন্দ্রশেখরের উদার মনে শৈবলিনী অনায়াসে স্থান লাভ করিল। তখন আবার তিনি তুচ্ছ সমাজের দিকে চাহিলেন না। যখন শৈবলিনী বলিল "আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী। বলুন আমি জাতিভ্রষ্টা কি না। আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে – কিন্তু গঙ্গার উপর।" "চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন;—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, 'হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম।'" বল দেখি ভাই, এ চন্দ্রশেখরের বিরাট মূর্ত্তি আমারা কিরূপে আঁকিব? ক্ষুদ্র মানব আমরা, আধ্যাত্মিক বীর চন্দ্রশেখরকে দূর হইতে দেখিয়াই বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

২। শৈবলিনী।

কোন একটি কাব্যচিত্রিত চরিত্র পরীক্ষা করিতে হইলে আমাদিগের প্রথমে দেখিতে হইবে, ইহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিতে সামঞ্জস্য আছে কি না? যদি তাহা না থাকে, তবে অস্বাভাবিক বলিয়া আমরা সে চিত্র উপেক্ষা করিতে পারি। কারণ যাহা জগতে নাই, হইতেও পারে না, সে চিত্রে প্রশংসার যোগ্য কিছু আছে, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে যে, যাহা জগতে নাই, তাহা কল্পিত হইল কি রূপে? ইহার মীমাংসা অতি সহজ। অংশ সম্বন্ধেই, অথবা মৌলিক অঙ্গ সম্বন্ধেই এই কথা সঙ্গত—অংশের সমাবেশে ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। এই কথাটি বুঝিলে, আমরা এই অংশগুলির সামঞ্জস্যেই কেবল স্বাভাবিকতা কেন দেখি, তাহা বুঝা যাইবে। বরং যে সকল চিত্রের অংশগুলির সামঞ্জস্য

বেশ্‌ আছে, অথচ যাহা জগতে দেখা যায় না, সেই সকল চিত্রেরই অথবা সেই সকল চিত্রের চিত্রকরগণেরই প্রশংসা অধিক।

তার পরে দেখিতে হইবে গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রথমে দেখিলাম, শিল্পচাতুর্য্য, উদ্দেশ্য না থাকিলেও কেবল ইহাতেই প্রশংসার কথা আছে। তার পরে, দেখিব, কারিকরের সুশিক্ষা ও সুরুচি। এই দুইটি বিষয়—চিত্রের স্বাভাবিকতা ও সদুদ্দেশ্য—যে পরিমাণে যাহাতে দেখিব, সেই পরিমাণে তাঁহাকে প্রশংসা করিব।

আমরা শৈবলিনীর চিত্রে এই দুইটিই অতি সুন্দর দেখিলাম। এই জন্যই আমরা বলিতে সাহসী যে, শৈবলিনী একটি পূর্ণ চরিত্র। কেবল মহত্ত্ব অঙ্কিত করাতেই যে প্রশংসা আছে এমত নহে, পাপ দেখাইতেও প্রশংসা আছে। শৈবলিনীর পাপচরিত্র কাব্যগ্রন্থের অতি উজ্জ্বল রত্ন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা এখন স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছি।

শৈবলিনী-জীবন বিশ্লেষণ করিলে, এই কয়েকটি প্রধান ভাব ও ঘটনা পরিলক্ষিত হইবে—(ক) প্রসক্তি (খ) পাপ (গ) অনুতাপ (ঘ) প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি (ঙ) সিদ্ধি বা পরিণাম।

শৈবলিনীর প্রসক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রতাপকে অবলম্বন করিয়াই তাহা বলিতে হইবে। ইহাই তাহার জীবনের প্রধান ভাব, অন্যান্য ঘটনা ইহারই পরিণাম মাত্র। শৈবলিনীর এই 'প্রসক্তি' বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিবার সময় আমরা ন্যায় অন্যায়ের কথা পাড়িব না—তজ্জন্য আমরা 'পাপ' নামক আর একটি পৃথক্‌ অধ্যায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

প্রসক্তির প্রকৃতি দেখাইতে কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইল, এ কথাটি বড়ই প্রয়োজনীয়। সে প্রণয় রূপজ না সংসর্গজ তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিলেই আমরা সে প্রসক্তির প্রকৃতি ও পরিণাম অনেকটা বুঝিতে পারি। এই জন্য প্রসক্তি দেখাইতে, তাহার উৎপত্তি, বিকাশ, পরিণাম এই তিনটিই আমাদিগের দেখিতে হইবে।

প্রথমে শৈবলিনীর প্রতাপাসক্তির উৎপত্তি দেখা যাউক। গ্রন্থকার ইহা সুস্পষ্ট দেখাইবার জন্য মূল গ্রন্থ ছাড়া আর একটি খণ্ড রচনার আবশ্যকতা বোধ করিয়াছেন। শৈবলিনীর প্রসক্তির প্রারম্ভ "চন্দ্রশেখরের" উপক্রমণিকায়। এই খানেই গ্রন্থকার শৈবলিনী ও প্রতাপকে আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে একত্র করিয়া ধরিয়াছেন। শৈবলিনী তখন ৭।৮ বৎসরের

বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, এই স্থলটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাই, বঙ্কিম বাবু গ্রন্থখানি কেমন সুন্দর আরম্ভ করিয়াছেন। এইখানে শৈবলিনীর বালিকা-চরিত্র বড়ই সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। সেই আকাশের তারা গণায়, ভাগিরথী স্রোতে বহমান নৌকা গণায়, সেই নৌকার দাঁড়ের জলে সোণা জ্বলিতে দেখায় বালক-বালিকার কোমল ও উৎসুক হৃদয়টি অতি কোমল ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

বালক-বালিকারা যেরূপ খেলিয়া থাকে, শৈবলিনী ও প্রতাপ ঠিক সেইরূপই খেলা করিত, আর বালক বালিকার এরূপ ঘনিষ্ঠতায় যে ফল ফলিয়া থাকে, এখানেও তাহাই ফলিল। গ্রন্থকার লিখিলেন "এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয় না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভাল বাসিতে জানে না।" শৈবলিনীর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, এ ভালবাসা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে চলিল। পরে জ্ঞান হইলে শৈবলিনী বুঝিল যে "প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই"।

গ্রন্থকার এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে দুই এক কথায় প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর ভালবাসার উৎপত্তি দেখাইলেন, তাহার কারণও বলিলেন।

এই প্রসক্তির প্রথম বিকাশ আমাদিগকে গ্রন্থকার এইরূপে দেখাইয়াছেন। যখন শৈবলিনী ও প্রতাপ উভয়েই বুঝিতে পারিল যে, এ জন্মে তাহাদিগের মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই, "দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে, দুই জনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল, আয় শৈবলিনি! সাঁতার দিই। দুই জনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুই জনেই পটু—তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না। বর্ষাকাল—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া, যাইতেছে। দুই জনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল; ফেণ-চক্র মধ্যে, সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয়, রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল। সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া

ডাকিয়া ফিরিতে বলিল।. বালক বালিকা শুনিল না—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুই জনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, 'শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে!' শৈবলিনী বলিল, 'আর কেন—এই খানেই।' প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।"

এই ঘটনায় প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয়ের দ্বিতীয় স্তর দেখান হইয়াছে। এখন হইতেই আবার তাহাদিগের প্রণয়ের সাধারণ ভাবটুকু পৃথক্ হইয়া পড়িবে। শৈবলিনী এখানে ডুবিতে পারিল না—তাহার ভয় করে। শৈবলিনীর স্ত্রীচরিত্র প্রতাপের পুংশ্চরিত্রের কাছে থাকিয়া তাঁহারই শোভা বর্দ্ধন করিল। শৈবলিনীর প্রণয় প্রতাপ-প্রণয়ের ন্যায় এখনও বিকশিত হয় নাই, তাই শৈবলিনী এখনও ভাবিতে পারিতেছে 'কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?' উভয়েরই পরিণামের কথা ভাবিয়া দেখিলে, এই ঘটনাটি বড়ই কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে বোধ হইবে। আরও একটি কথা এখানে বলিতে হইবে। শেষে শৈবলিনীর আমরা যে সাহস দেখিতে পাইয়াছি, তাহা এখানে দেখিতে পাইলাম না। কিছু দেখিতে পাইলাম—ঐ রকম একটা উদ্যোগেও সাহসের কম পরিচয় নহে;—তবে, নিরাশার যে প্রবল সাহস, তাহা এক্ষণে শৈবলিনীতে দেখিতে পাইলাম না। তাহার কারণ এখনও সম্যক্ ঘটে নাই।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। বোধ হয়, আর একদিন আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ততর করিয়া মুখ দেখাইবে, ভাবিতেছিল।

শেষে শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের বিবাহ হইল। এই বিবাহের আট বৎসর পরে, এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এতকাল শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরের ঘর করিলে পর, গ্রন্থকার এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিলেন। কারণ পরে পরিস্কার করিয়া বুঝাইতেছি।

চন্দ্রশেখর কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। শৈবলিনী ও প্রতাপ সম্বন্ধীয় কথাও পাঠকবর্গ অবগত হইলেন। এখন তাঁহারা অতি সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন, চন্দ্রশেখরের সহ-

বাসে শৈবলিনীর মন প্রতাপ সম্বন্ধে কিরূপ ভাবাপন্ন হইতে পারে। শৈবলিনী অশিক্ষিতা—কিন্তু অশিক্ষিতা বলিয়া কাহারও হৃদয় প্রণয়-শূন্য থাকে না। এ প্রণয় তাহার পাত্র অন্বেষণ করিয়া লইবেই। চন্দ্রশেখর দ্বারা শৈবলিনীর অশিক্ষিত হৃদয় তৃপ্ত হইল না। ইহার কারণ আমরা দুই খানি ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। কবিপ্রবর টেনিসন গুইনিবার মুখে তাঁহার স্বামিপ্রতি অনাসক্তির কারণ এইরূপে বলিলেন,

'Arthur, my lord, Arthur, the faultless king'
The passionless perfection, my good lord—
But who can gaze upon the sun in heaven ?
* * * * * *
* * * but, friend, to me
He is all fault who hath no fault at all :
For who loves me must have a touch of earth ;
The low sun makes the colour : &c—

আবার, পণ্ডিতপ্রবর টেইন্ মিল্টনের জীবন-চরিত সমালোচনায় লিখিয়াছেন,

Nothing displeases women more than an austere and self contained character. They see that they have no hold upon it ; its dignity awes them, its pride repels, its pre-occupations keep them aloof ; they feel themselves of less value, neglected for general interests or speculative curiosities ; judged, more over, and that after an inflexible rule, at most regarded with condescension, as a sort of less reasonable and inferior being, shut out from the equality which they look for, and the love which alone can recompense to them the loss of equality.

ইহার প্রথমটি কোমলহৃদয় কবির লেখা—দ্বিতীয়টি কঠোর নীতিবিদের লেখা। যাহা হউক, ইহার মধ্যস্থিত সাধারণ কথাটি এদেশে না হউক অন্যত্র অনেক পরিমাণে সত্য। শৈবলিনীর পক্ষে তাহাই ঘটিল। শৈবলিনীর মন চন্দ্রশেখরে অনুরক্ত না হইতে সুযোগ পাইল। প্রতাপ আসিয়া তুলনায় সমধিক সুন্দর হইয়া শৈবলিনীর সম্মুখে দাঁড়াইল। শৈবলিনীর প্রতাপ-প্রণয়-কোরক নীরবে ফুটিয়া পড়িল। এইখানে আমরা সেই প্রণয়ের তৃতীয় স্তর দেখিতে পাইলাম।

যেরূপ কোন একটি জিনিসের বল পরীক্ষা করিতে হইলে, তৎবিরুদ্ধে অন্য একটি বল প্রয়োগ আবশ্যক, প্রণয়-বল পরীক্ষা করিতেও সেইরূপ

তদ্বিরুদ্ধে অন্য বল প্রয়োগ আবশ্যক। প্রণয়-প্রতিরোধী অবস্থার সংঘর্ষণেই এই বল আমরা স্ফুটতর দেখিতে পাই। শৈবলিনীর প্রতাপ-মিলন পথে অনতিক্রমণীয় অনেকগুলি বাধা ছিল। স্বয়ং প্রতাপই ইহার একটি প্রকাণ্ড বিঘ্ন। তাই শৈবলিনীর প্রণয় এত খুলিয়াছে। বিবাহ হইবে না, অবস্থা প্রতিকূল, তাহাতেই শৈবলিনীর একদিন ডুবিয়া মরিতে সাধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার প্রণয় পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাই সে প্রতাপের ন্যায় ডুবিতে পারিল না। এখন শৈবলিনীর বিবাহ হইল, শৈবলিনী সংসারী হইল,প্রতাপ-প্রণয়-বিরোধী অবস্থাগুলি সব জড় হইল, কিন্তু তবু শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না। প্রতাপ আসিয়া তাহার সেই অন্তরটি যুড়িয়া বসিল। শৈবলিনীর প্রণয়ে মোহ জন্মিল। এই খানেই আমরা এ প্রণয়ের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইলাম।

যখন আমরা শৈবলিনীকে ভীমা পুষ্করিণী মধ্যে অত ব্যাপিকা, অত সাহসিনী দেখিতে পাইলাম, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, যে শৈবলিনী এখন সে মোহে উন্মত্তা—শৈবলিনীর হৃদয় এখন অশান্তিতে পরিপূর্ণ। যখন আমরা শৈবলিনীকে নির্ব্বিবাদে লরেন্স ফষ্টরের সহিত গমন করিতে দেখিলাম, সুন্দরীর সহিত তাহার কথোপকথন শুনিলাম, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, শৈবলিনী কেন এত উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া পড়িয়াছে। যাহার মনে সুখ শান্তি নাই, তাহার আবার ভবিষ্যৎদৃষ্টি কিসের? তাহার আবার সমাজভয় কিসের? শৈবলিনী একস্থলে বলিয়াছে "পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়?" লজ্জা, ভয়, অভিমান, যাহাই বল, সবই জীবনের জন্য। যাহার জীবনভার দুর্ব্বিসহ, তাহার ইহাতে ভয় কি? অনেকে শৈবলিনীর চরিত্রে অস্বাভাবিকতা দেখিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিমবাবুর প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা জন্যই হউক, বা যুক্তিসঙ্গত অন্য কারণেই হউক,আমরা ইহাতে এত দোষ দেখিতে পাই না। কিন্তু শৈবলিনীর চরিত্র যে ঠিক বাঙ্গালির মেয়ের মত হয় নাই, একথা সম্পূর্ণ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে একটি কথা আছে। শৈবলিনীই বল, আর চন্দ্রশেখরই বল, ঠিক মানুষ গড়া কবির অভিপ্রায় নহে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মানবচিত্র কয়েকটি অবলম্বন করিয়া ভাবরাজ্যের কতকগুলি চিত্র বিকশিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কবি ঐরূপ করিয়া

শৈবলিনীকে উচ্ছৃঙ্খলা করিয়া শৈবলিনীর মোহ বা উন্মত্ততা, তাহার যন্ত্রণারাশি, যেরূপ স্ফুটতর করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আর কিসে হইত? হৃদয়ে যখন একটি ভাব সমধিক প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমরা অন্য সব বিস্মৃত হইয়া কেবল তন্ময় হইয়া পড়ি। তাই আমরা শৈবলিনীকে প্রতাপ-মিলনেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীজাতিসুলভ ভাবগুলি পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। এটি ইংরাজি শিক্ষার কুফল বলিয়া কাহাকেও দুঃখিত হইতে হইবে না; অন্য সকলে ঠিক থাকিলে, বঙ্কিম বাবুর জন্য সে ভয়টি না করিলেও চলিতে পারে।

শৈবলিনীর এই প্রণয়ের বহির্বিকাশ আমরা কয়েকটি স্থানে অতি সুন্দর রূপেই দেখিতে পাইয়াছি। ফষ্টরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া যে দিন প্রতাপ শৈবলিনীকে নিজ গৃহে দেখা দিলেন; যে দিন প্রতাপ-উদ্ধারের জন্য শৈবলিনী পুরুষোচিত সাহসে সাহসিনী হইয়া নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল; যে দিন ভাগিরথী-বক্ষে প্রতাপকে বাঁচাইবার জন্য শৈবলিনী প্রতাপের নিকট সেই নিদারুণ শপথ করিল; আমরা শৈবলিনীর প্রতাপ-প্রসক্তির বল পরিমাণ করিতে পাইলাম।

এখন শৈবলিনীর প্রতাপ-প্রণয়ের পরিণাম পরীক্ষা হইবে। যখন শৈবলিনী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিতা, যখন গ্রন্থকার লিখিলেন, শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল, তখনও শৈবলিনী প্রতাপ সহিত পুনঃ সাক্ষাতে বলিল "তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

এইরূপে আমরা শৈবলিনীর প্রতাপ-প্রসক্তির উৎপত্তি, বিকাশ, ও পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, শৈবলিনীর এ প্রসক্তি—প্রগাঢ়, স্থায়ী, ও অপ্রমেয়।

শৈবলিনীর চরিত্রে মনুষ্য জীবনের একটি অতি কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শৈবলিনীর 'পাপ'ই সেই কঠিন সমস্যা। এই পাপ যতদূর সূক্ষ্ম করিতে পারা যায়, কবিবর প্রথমে তাহাই করিয়াছেন। পাপ সূক্ষ্ম করা অর্থ পাপের কতকগুলি কারণ (Extenuating circumstances) দেখান ও পাপের কঠোরতা হ্রাস করা। শৈবলিনীর অধিক বয়সে তাহার মনের

অসম্মতিতে বিবাহ, তাহার প্রতাপাসক্তির অপ্রমেয়ত্ব, তাহার স্বামি-ভক্তি এবং তাঁহার মহত্ত্বে বিশ্বাস, এই গুলি সেই (Extenuating circumstances)। এতদ্ভিন্ন আরও একটি আছে। সেটি প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর বাল্যাবধি একত্র ক্রীড়া, সহবাস ইত্যাদি। শৈবলিনী মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে, সুতরাং প্রতাপকে ভালবাসিতে প্রথমে তাহার কোন পাপ বোধ হয় নাই। আবার শৈবলিনীর পাপের প্রকৃতিও কিছু অন্যরূপ। সে মনে মনেই অসতী—কার্য্যগত তাহার কোন পাপ ছিল না। এই মানসিক পাপটিকে যতদূর সূক্ষ্ম করা সম্ভব, কবিবর এইরূপে তাহাই করিয়া সেই সূক্ষ্ম পাপেরও পরিণাম দেখাইয়াছেন।

সকল বিষয়েরই প্রায় একটা সময় স্থির আছে। অনুতাপেরও তাহাই। যাহারা পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সকলেরই যে সকল সময়ে অনুতাপ হইবে, এরূপ ভরসা করা যায় না। প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই, যে, পাপকার্য্যে যখন আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ পরিতৃপ্ত হয়, বা যখন সেই পাপ-কার্য্য অভীষ্ট ফলোৎপাদক না হয়, অথবা যখন তাহার অনুষ্ঠানে বিশেষ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখনই পাপীর হৃদয়ে পাপানুষ্ঠানজনিত কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে।

শৈবলিনীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেও আমরা ঠিক ইহাই দেখিতে পাইব। শৈবলিনীর হৃদয়খানি প্রতাপে ভরা—প্রতাপের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার্য্যা। প্রতাপ-প্রাপ্তি-পথে সে কোন বিঘ্নকেই বিঘ্ন জ্ঞান করে নাই;—প্রতাপকে পাইবার জন্য সে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা, ভয়, প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে। এ পথে এ পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু শত সহস্র বিঘ্ন পায়ে ঠেলিয়াও সে যখন প্রতাপের নিকট শুনিল যে তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার নহে; যখন এইরূপ একটি অনতিক্রমণীয়া বাধা আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল, তখন আর তাহার পূর্ব্বের আত্মবিস্মৃতি থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

"শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীর পার্শ্বে শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল,—সেই করবীর সর্ব্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া নীলাকাশকে

আকাঙ্ক্ষা করিয়া তুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। * * *। শৈবলিনী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিল '* * * অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।'" শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল। এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। আত্মহত্যার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। শৈবলিনী ভাবিল 'মরিত বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব, যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তার পর মরিব।—আর তিনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই, কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?' শৈবলিনীর অনুতাপের প্রথম অধ্যায় এইরূপে আরম্ভ হইল। আশাপথে বিঘ্ন ঘটিল বলিয়া শৈবলিনীর এই বোধটুকু হইল। কিন্তু এখনও শৈবলিনীকে আমরা গুইনিবিয়ারের ন্যায় সম্যক্ অনুতপ্তা দেখিতে পাই না, এখনও প্রতাপের সহিত তাহার মিলনেচ্ছা সম্যক্ দূরীভূত হয় নাই। তাই যখন আমরা দেখিলাম গঙ্গাবক্ষে এ ক্ষীণ আশাটিও তাহাকে বিদূরিত করিতে হইল, তখন আমরা শৈবলিনীকে আত্মবোধসম্পন্না দেখিতে পাইলাম। তখন হইতে শৈবলিনী মনকে দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—তখন হইতে পাপেচ্ছা তাহাকে ছাড়িয়া চলিল। যে ভয়ে গুইনিবিয়ার ল্যান্সেলটের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; ঠিক সেই কারণেই শৈবলিনী প্রতাপের নিকট হইতে পলায়ন করিল। "যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে

পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ,সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ,এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে, কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে?"

শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য প্রায়ই এক—তবে আপনা হইতে বা দৈব হইতে আগত কষ্টকে আমরা শাস্তি বলি, ও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গৃহীত কষ্টকে আমরা প্রায়শ্চিত্ত বলি। প্রায়শ্চিত্তকে এক প্রকার চিকিৎসা বলা যাইতে পারে। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তকে এক প্রকার তাহার বিকৃত মনোভাবের চিকিৎসা বলা যায়। শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্তা, সুতরাং তাহার মনোভাব সমধিক বিকৃত ভাবাপন্না। আমাদের বঙ্গীয় কবির চিকিৎসা-প্রকরণ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি—শত সহস্রবার প্রাণ্ খুলিয়া তাঁহাকে ভক্তি উপহার দিয়াছি। চন্দ্রশেখরের "প্রায়শ্চিত্ত" খণ্ড একটি অপূর্ব্ব জিনিস। দুই এক কথায় তাহা কি বুঝাইব? তাহা বুঝানও দুষ্কর। গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন, "যে বলিয়াছিল এইরূপে স্বামিধ্যান কর, সে অনন্ত মানব-হৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে।" আমারাও বলি,যাঁহার মস্তিষ্ক হইতে ইহা বাহির হইয়াছে, তিনি মনোবিজ্ঞানে সম্যক্ অভিজ্ঞ—অতি উচ্চশ্রেণীর কবি। আধ্যাত্মিক উন্নতি যে দেশে একদিন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই আর্য্য দেশেই এইরূপ কল্পনা সম্ভবে। ইহার অধিক আর কি বলিব?

প্রায়শ্চিত্তের ফলে শৈবলিনীর মনে স্বামীর মহত্ত্ব দৃঢ় অঙ্কিত হইল, শৈবলিনী স্বামীকে ভাল বাসিতে লাগিল।

একদিন আমরা যে শৈবলিনীকে বলিতে শুনিয়াছি, "কে তুমি? প্রতাপ না, কোন দেবতা ছলনা করিতে অসিয়াছ?" আবার, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার এই অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল।—" সেই শৈবলিনীকেই আবার আমরা আর একদিন অন্যরূপ দেখিতে পাইলাম। অবসন্ন মনে একাগ্রচিত্তে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনীর চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

"বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ—কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরু-নিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দরগঠন, সুকুমারে বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্রশোভিত শাল-তরু,—মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্র-স্থিত মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিজাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার কি যোগ্যা—বালিকা, অজ্ঞান,—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম,—মরিলাম না কেন?" অন্যত্র "তখন সে (শৈবলিনী) মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—'কোথায় তুমি স্বামিন্! কোথায় স্বামী—স্ত্রী-

জাতির জীবন-সহায়, আরাধনার দেবতা, সর্ব্বে সর্ব্বমঙ্গল! কোথায় তুমি, চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র, সহস্র প্রণাম! তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারেন না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া, চরণ যুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও—তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।”

শৈবলিনী চন্দ্রশেখরে পূর্ব্বে যাহা অভাব ছিল বলিয়া বোধ করিত, ঠিক তাহাই এখন আবার তাঁহাতে সমধিক প্রবল দেখিতে পাইল।

পরিণাম সম্বন্ধে আর এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। শৈবলিনীর মনের পাপ মনের প্রায়শ্চিত্তেই শুধরাইয়া গেল, চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন।

এখন আমরা মোটের উপর গোটাকতক কথা বলিতে চাহি। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—“মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।” এই কারণেই, যে শৈবলিনীকে আমরা এক দিন বলিতে শুনিয়াছি “তাঁহাকে (চন্দ্রশেখরকে) আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—” সেই শৈবলিনীকে আবার গ্রন্থকার চন্দ্রশেখরকে ভাল বাসাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধেই তিনি মুক্তকণ্ঠে লিখিয়াছেন “শৈবলিনীর চিত্তে চির প্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু তাড়িত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।” আর্য্যকবি দেখাইয়া গেলেন যে, ভালবাসা সাধনার ফলে সর্ব্বত্রই বিস্তারিত হইতে পারে। মনের উপর এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রভুত্ব আছে। আর ইহা তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠা বলিতে পারিয়াছেন। শৈবলিনী কেন আগে এ সাধনা করে নাই—এই তাহার পাপ। আমাদিগের বোধ হয় যে, যাঁহারা বর্ত্তমান শতাব্দীর বাহিরের কার্য্য প্রণালীর নিন্দা করিয়া, বহিঃস্থ সমাজের দোষ দিয়া, এই সকল পাপকার্য্য ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে তিনি শিখাইয়াছেন, যে, ইহা বাহিরের তত দোষ নয়, যত দোষ অন্তরের—সমাজের তত দোষ নয়, যত দোষ ব্যক্তি বিশে-

ষের। তোমরা সমাজের নিন্দা করিয়া, হিন্দু-বিবাহ-প্রণালীর নিন্দা করিয়া শৈবলিনীকে সমর্থন করিতে পারিবে না, কারণ গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, যে, শৈবলিনীর আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ থাকিলে সকল গোলই মিটিতে পারিত। **ইহাই শৈবলিনী-চরিত্রের নীতি বা উদ্দেশ্য।**

৩। প্রতাপ।

বীরত্বে প্রতাপ অতুলনীয়। এই সংক্ষিপ্ত কথাটির মধ্যেই প্রতাপের সমগ্র চরিত্র নিহিত আছে—ইহাই তাঁহার সুচরিত্রের সমীচীন প্রশংসা। প্রতাপকে আমরা যখন যেখানে দেখিতে পাইয়াছি—তাঁহাকে এই অদ্বিতীয় বীরভাবেই দেখিতে পাইয়াছি। কি উদয়নালার যুদ্ধক্ষেত্রে, কি স্বকীয় আবাস ভবনে,—কি শৈশবে, কি যৌবনে,—কি জীবনে, কি মরণে,—সর্ব্বত্রই আমরা তাঁহার সেই বিপুল শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বীরত্ব দেখিয়া বিস্ময়াম্বিত হইয়াছি। প্রতাপ প্রতাপে বীর, প্রতাপ নম্রতায় বীর। প্রতাপ প্রণয়ে বীর, প্রতাপ জিতেন্দ্রিয়তায় বীর। প্রতাপ শত্রুদলনে বীর, প্রতাপ পরোপকারে বীর। প্রতাপ কার্য্যে বীর, প্রতাপ ভক্তিতে বীর, জ্ঞানেও বীর। এমন অদ্ভুত বীরত্বের সমাবেশ আর কোথাও দেখিয়াছ কি? তাই বলিতেছিলাম যে প্রতাপের বীরত্ব দেখাইতে পারিলেই, আমরা তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি দেখাইতে পারি।

এই প্রতাপের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ ভাগিরথী-তীরস্থ আম্রকাননে। প্রতাপ তখন কিশোর বয়স্ক। তখন তাঁহার শৈবলিনী-আসক্তি "শৈবলিনীর জন্য নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়ায়" ও "আম্রের সময়ে সুপক্ক আম্র পাড়ায়"ই প্রকাশিত হইত। বালক প্রতাপ ভালবাসাতেও 'মুখ সর্ব্বস্ব' ছিল না। বাল্যকাল ছাড়াইয়া যখন প্রতাপ যৌবনে পদার্পণ করিলেন, ভালবাসার সঙ্গে যখন 'বিবাহ' কথাটি একত্রিত হইয়া তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল, যখন প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন যে শৈবলিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ অসম্ভব, তখনই আমরা এ আসক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রণয়-প্রতিরোধী অবস্থার সংঘর্ষণেই প্রণয়-বল প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতাপ বীরপুরুষ—আর প্রণয়ই যৌবনের আরাধ্য দেবতা, তাই প্রতাপের বীরত্ব এখানে সেই দেবতা সমীপে আত্মবলি। যদি শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের বিবাহ হইতে পারিত,

এ আত্মবলির অর্থ অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম ; কিন্তু তাহা হইল না, তাই আমরা সেই আত্মবলিদানেচ্ছু প্রতাপকে ভাগরথী-গর্ভে ডুবিয়া মরিতে চেষ্টিত দেখিলাম। শৌবলিনী ডুবিতে পারিল না, কিন্তু প্রতাপ পারিল। কারণ প্রতাপ বীর—এবং এই খানে তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্য আত্মহত্যা। ভালবাসায় প্রতাপের মত বীর কে ?

চন্দ্রশেখর প্রতাপকে রক্ষা করিলেন। জল হইতে তাঁহাকে তুলিয়া বাটী রাখিয়া আসিলেন। বীর প্রতাপের বীর হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় মাতিয়া উঠিল। পূর্ব্বে তাহার বীরত্ব এক বিষয়েই নিবদ্ধ ছিল, এখন আর একটি বিষয় পাইল। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে প্রতাপের মত বীর কে ?

"চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়স্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে। চন্দ্রশেখর, কাসেম আলি খাঁর শিক্ষাদাতা ; তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর, নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন।" চন্দ্রশেখরের এ ঋণ কি পরিশোধ করা যায় ? কিন্তু তাহা প্রতাপ সম্যক্‌রূপে পরিশোধ করিয়াছিলেন। কিরূপে, তাহার পরিচয় আমরা ক্রমে দিতেছি।

প্রতাপের বড়ই অদৃষ্টের জোর ছিল—বিধাতার ইচ্ছাক্রমে শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইলেন। প্রতাপের ভক্তির পাত্র ও প্রতাপের প্রেমের পাত্র সুখ-দুঃখে মিলিত হইলেন। একের স্বার্থ অন্যের হইল। প্রতাপ এখন এক জনেরই নিকটে আবদ্ধ হইলেন—প্রতাপের বীরত্বের বিষয় আবার এক হইয়া পড়িল। এক চন্দ্রশেখরই প্রতাপের লক্ষ্য হইলেন। প্রতাপেয় বীরত্ব ফুটিয়া পড়িল। এ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ না হইলে কি প্রতাপের চরিত্র এত ফুটিতে পারিত ?

এখন এক চন্দ্রশেখরেই প্রতাপের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ রহিল ; প্রতাপ সেই চন্দ্রশেখরের সুখকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া রাখিলেন। ইহাই তাঁহার জীবন-সমুদ্রে একমাত্র পরিদর্শক হইল। আমরা তাহা বিস্তৃত করিয়া দেখাইতেছি।

এই সকল ঘটনার পরে প্রতাপের সহিত আমাদিগের পুনঃ সাক্ষাৎ—

প্রতাপের নিজ বাড়ীতে। দরিদ্র প্রতাপ তখন একজন বিখ্যাত জমীদার। সুন্দরী বেদগ্রাম হইতে সে দিন ভগিনীকে দেখিবার জন্য প্রতাপের আলয়ে আসিয়াছিল।

"অবকাশমতে প্রতাপ, সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুন্দরী বলিলেন 'আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি, বলি শুন।' এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, 'এত দিন আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন?' সু। 'কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে?' প্র। 'কি হইবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।' সু। 'তুমি উপকার করিবে কি না, তা জানিব কি প্রকারে?' প্র। 'কেন তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?' সু। 'জানি। কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড়মানুষ হইলে পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যায়।' প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল। পরদিন প্রতাপ, এক পাচক ও এক ভৃত্য-মাত্র সঙ্গে করিয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, 'আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।'"

ইহার পরে আমরা দেখিলাম—প্রতাপ শৈবলিনীকে ফষ্টর-গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টায় তাঁহার চতুরতা, তাঁহার অপরিসীম সাহস ও তাঁহার শারীরিক বীরত্ব সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। যখন এ কার্য্য শেষ হইল, প্রতাপ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। শৈবলিনীকে তিনি জগৎ শেঠের গৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৃত্য তাহার নিজের ইচ্ছামতে তাঁহার গৃহেই শৈবলিনীকে লইয়া গিয়াছিল।

"প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালীন গঙ্গার স্থির শ্বেত-বারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল-শ্বেত পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে।

মনোমোহিনী স্থির শোভা! দেখিয়া, প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না, এমত নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি-সাগর মথিত হইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।" প্রতাপের বীরত্বের আজি ভয়ানক পরীক্ষার দিন। ধার্ম্মিক গোবিন্দলালও এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। সে অবস্থা হইতেও এ অবস্থা অনেক কঠিন। শৈবলিনী একে বাল্যসহচরী—তাহে হৃদয়ের অধীশ্বরী। কিন্তু তবু প্রতাপ একটুকুও টলিলেন না—প্রতাপের মত জিতেন্দ্রিয় কে?

শৈবলিনী প্রতাপকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রতাপকেই তাহার শুশ্রূষা করিতে হইল। শৈবলিনী সম্পূর্ণ রূপে সুস্থিরা হইলে তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে তথা হইতে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, 'যাইও না।' প্রতাপ অনিচ্ছা পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। "শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন তোমরা আমাকে এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?' প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, 'তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?' শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীতভাবে, প্রায় বাষ্পগদ্গদ হইয়া বলিলেন, 'যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেই খানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে তো বন্দুক ছিল।' প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই। কিন্তু তোমার মরণই ভাল।' শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল,—'আমার মরণই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক,—তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া, কুপথ সুপথ জ্ঞান শূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।' প্রতাপ বলিলেন, 'তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং

আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমায় দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?' শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, 'তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার এই অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে * * *' শুনিয়া, প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।"

এই খানে প্রতাপের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবল বল দণ্ডায়মান হইয়াছিল; শৈবলিনীর সেই অতুল্য রূপ—সেই কাল—সেই স্থান—শৈবলিনীর সেই প্রতাপ-প্রণয়োচ্ছ্বাস—আবার প্রতাপের জন্য শৈবলিনীর সেই দুঃখকাহিনী—সব একত্রিত হইল, কিন্তু তবুও প্রতাপ ধর্ম্মপথস্খলিত হইলেন না—মনে কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিলেন না। বরং শৈবলিনীকে তাহার জন্য যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন—সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। এ সব কত বড় বীরত্বের কথা? আবার দেখ, এত বড় বীরত্বের মধ্যেও কোমলতা কেমন মধুরভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। প্রতাপ তখন শৈবলিনীর জন্য কাতর হইলেন। তাঁহার মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। 'তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায়, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।' ধন্য প্রতাপ!—এরূপ বীরত্ব তোমাতেই দেখিতে পাই! জগতে তোমার তুল্য বীর কে? এরূপ পরীক্ষায় কয় জনে উত্তীর্ণ হইতে পারে? আর,—আর, এরূপ পরীক্ষা দ্বারা এরূপ চরিত্রের এরূপ বিকাশ কয় জনে দেখাইতে পারে? কাব্যাংশে এ স্থলটি অতীব মনোহর ও কৌশলময়। ইহা দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে, 'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিম বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

ইহার পরে প্রতাপ বন্দীকৃত হইয়া ইংরাজ-সমীপে আনীত হইলেন। শৈবলিনী তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া পূর্ব্বের ঋণটি পরিশোধ করিলেন। আবার আমরা দুই জনকে গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিতে দেখিলাম। সেই পুণ্য-সলিলা ভাগিরথীর দেশব্যাপিনী চন্দ্রকরবিধৌত সলিলরাশির উপরে পুণ্যমনা প্রশস্তহৃদয় পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রতাপের সে দিনকার কথা মনে পড়িলে কাহার না বিস্ময় জন্মে? সে কি সাধারণ ত্যাগ? যখন শৈবলিনী বলিল, 'এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?' প্রতাপ

বলিলেন 'আমি'।—কেন প্রতাপ? তোমার আবার দুঃখ কিসের? এই "আমি" বলাতে তোমার যে সুখ হইল, শত সহস্র শৈবলিনী উপভোগেও ত তাহা তোমার হইতে পারিত না! তোমার মত সুখী কে?

যিনি মানব-চরিত্র সম্যক্ অবগত নহেন, তিনি অবশ্য এ শপথে ইতর-জনোচিত কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। এই রূপ 'ভাই-ভগিনী' সম্বোধনে তাঁহারা প্রতাপের মানবীয় দুর্ব্বলতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণই হইতে পারেন—অথবা এ স্থলটি অপ্রতাপোচিত এবং গ্রাম্যকথায় পরিপূর্ণ বলিয়া গ্রন্থকারকে গালি পাড়িতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে এ স্থলটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। প্রতাপ আদর্শ-চরিত্র হইলেও মানুষ ত বটে। অন্য মানবের ন্যায় তাঁহারও ত ইন্দ্রিয়-বিকার ছিল—নহিলে তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া প্রশংসা করিব কেন? প্রতাপকে যখন মানুষের মধ্যে আদর্শ-চরিত্র করা হইয়াছে, তখন মানুষের যাহা প্রকৃতি, তাহা তাঁহাতে না দেখাইলে চলিবে কেন?—তাঁহাকে আদর্শ-চরিত্র বলিয়া আমরা গ্রাহ্য করিব কেন?—কাব্যস্থ হইয়া তিনি আমাদিগের মন এত আকর্ষণ করিতে পারিবেন কেন? কাজেই প্রতাপের সেই মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্মটুকু ছিল। তাই ছিল বলিয়া আজি তিনি শৈবলিনী দ্বারা ঐরূপ শপথ করাইয়া লইলেন। এ শপথের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য শৈবলিনীর প্রতাপ সম্বন্ধীয় কুপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন, কিন্তু গৌণভাবে তাঁহারও মন স্থিরতর করা এ কার্য্যের লক্ষ্য ছিল। হিন্দু প্রতাপ গঙ্গাগর্ভে বসিয়া যদি ঐরূপ শপথে আবদ্ধ হয়েন, তবে এতৎ-সম্বন্ধে তাঁহার যতদূর সাবধানতা গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহা করা হয়। গঙ্গাগর্ভে বসিয়া হিন্দু যুবক-যুবতী যদি ভাই-ভগিনী কিম্বা জনক-দুহিতা সম্বন্ধে গ্রথিত হয়েন, তবে সে যুবক-যুবতীর পাপাচরণ সহজে সম্ভব নহে। প্রতাপ সে শপথে এতটা ভাবিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ হিন্দু হইলে এ শপথের গভীর অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোককে বা অপূর্ণ শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হিন্দুকে ইহার তাৎপর্য্য একটু ভাবিয়া বুঝিতে হইবে। অন্য সময়ে এ কথা লেখাও অতিরিক্ত বোধ হইত।

ইহার পরে প্রতাপের সহিত দেখা আবার তাঁহার নিজ বাড়ীতে। প্রতাপ তখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন,—

"প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, 'আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।' কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, 'আমার দোষ কি? আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম পথে

যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে (প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে শৈবলিনী সে দিন গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে) তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে। অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্‌স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া অগ্নি সৎকার করিতে হইবে নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য, কেননা ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।"

কি সুন্দর—কি স্বাভাবিক—কি প্রতাপোচিত চিন্তা! এই চিন্তায় কবিপ্রবর আমাদিগের দেশের একটি অতি গূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলে, তাহা আমাদিগের দেশে এইরূপ কারণেই প্রায় সমুত্থিত হইত এবং আমাদিগের বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও এইরূপ কারণেই সমুত্থিত হইবে। রমণীর সতীত্ব ভারতে বড়ই মূল্যবান বস্তু, এ বস্তুতে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে শবাকার দেহেও অপরিমিত বলের সঞ্চার হয়। ইতিহাস ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল। রাজপুতানার অদ্ভুত বীরত্ব ও দেশহিতৈষণা প্রায় এই কারণেই উৎপন্ন। তাহাদিগের সেই পরম পবিত্রা সাবিত্রীতুল্যা রমণীর অঙ্গ মুসলমানে স্পর্শ করিবে?—দেবতার আদরের জিনিস কুক্কুটে উপভোগ করিবে?—যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের হৃদয়ে এক বিন্দুও শোণিত থাকিবে, তাহারা তাহা পারিবে না। এই কারণেই আমরা রাজপুতানার রণস্থলে জগতে অতুল্য সেইরূপ বীরত্বের ক্রীড়া দেখিতে পাই—এই প্রাণের ধনে আঘাত লাগিবে বলিয়াই তাহাদিগের সেইরূপ স্বদেশরক্ষার্থ চেষ্টা বা দেশভক্তি দেখিতে পাই। এখনও দেখ, বাঙ্গালী

মৃত্যুকে যে এত ভয় করে, তবু এ সতীত্ব রত্ন যেখানে অপহৃত হয়, সেখানে এ ভয় থাকে না। সেখানে তাহাদিগের দুর্ব্বল বাহুতেও অপরিমিত বলের সঞ্চার হয়। ইংরেজ আমাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিলেও, হাতে ধরিয়া জুতা মারিলেও, বাঙ্গালী একা তদ্বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিবে না—কিন্তু যদি একবার ইংরেজ স্বধর্ম্ম ভুলিয়া,পূর্ব্বচরিত ভুলিয়া বাঙ্গালায় আসামের অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েন—এই রুগ্ন,জীর্ণ,দুর্ব্বল বাঙ্গালিকুলও প্রত্যেকে এবং সকলেই তৎপ্রতিবিধানার্থ প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এইরূপ একটা কারণ না ঘটিলে, এইরূপ একটা অত্যাচার না হইলে, দেশভক্তি ফুটিতে পারে না। বিজয়ীর অত্যাচারই বিজিতের দেশভক্তি উদ্রেক করিয়া থাকে। আমাদিগের মহাকবি ঐ কয়েকটি কথায় এতগুলি তত্ত্ব বুঝাইয়া গেলেন! প্রতাপ এই কারণেই স্বদেশরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন। এই কারণেই তিনি অল্প দিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ সেনাপতি গুরগন্ খাঁরও চিন্তার বিষয় হইলেন।

এক্ষণে প্রতাপ ইংরাজদিগকে বিদূরিত করিতে নানাবিধ উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। "তার পর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে * * অতএব আমি ইহা করিব।"

প্রতাপ তাঁহার অপমানকারী ইংরাজের অনিষ্টসাধনের প্রথম কারণ দেখিলেন,—'ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে'!

তার পরে প্রতাপকে আমরা দেখিলাম সেই উদয়নালার যুদ্ধক্ষেত্রের পথে। প্রতাপের সেই শেষ দিন। পথে শৈবলিনীর সহিত তাঁহার কিরূপ কথোপকথন হইল, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। শৈবলিনীর শেষ কথা শুনিয়া, "প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কষাঘাত পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। গমনকালে চন্দ্রশেখর, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা যাও?' প্রতাপ বলিলেন 'যুদ্ধে।' চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'যাইও না যাইও না। ইংরাজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।' প্রতাপ বলিলেন, 'ফষ্টর এখনও জীবিত আছে। তাহার বধে চলিলাম।' চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্গা

ধরিলেন। বলিলেন, 'ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম সেই শক্রর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সে শক্রকে ক্ষমা করে।' প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, 'আপনিই মনুষ্য মধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।' দেখিলে এখন বীর প্রতাপকে? মহত্ত্ব অনুভব করায়, মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত করায়, প্রতাপের মত বীর কে?

যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতাপ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। প্রতাপ যে কেন প্রাণত্যাগ করিলেন তাহা তিনি মৃত্যুকালে এইরূপে বুঝাইয়াছেন। 'শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে তাহার আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাঁহারা আমার পরমোপকারী, তাঁহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই, আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে, প্রাণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত,কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।' প্রতাপ কেবল নিজের হৃদয়কে অবিশ্বাস করিয়া বা সংযত না রাখিতে পারিয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই—তিনি থাকিলে কখন না কখন শৈবলিনীর চিত্ত বিচলিত হইবার সম্ভাবনা—তাই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন!

এক এক করিয়া আমরা প্রতাপ জীবনের সমস্ত কার্য্যই পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—আমরা প্রতাপকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই তাঁহাকে চন্দ্রশেখরের হিতকামনায় কার্য্যতৎপর দেখিয়াছি। তাঁহার কার্য্য সমস্তই চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য। প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য। * ফষ্টরকে শাস্তি প্রদান করিয়া শৈবলিনীকে উদ্ধার

---

* এই বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলিয়া লইতে হইল। শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের প্রগাঢ় প্রসক্তি সত্ত্বেও প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে আমাদিগের মতে তিনটি উদ্দেশ্যে কবি প্রতাপের এই বিবাহটি ঘটাইয়াছেন।(১)প্রতাপের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তিনি বিবাহ না করিলে এত সহজে—

করিয়াছেন, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য; ইংরেজ কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য; সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন

আর সহজেই বা কি করিয়া বলি ?--শৈবলিনী উপভোগের আকাঙ্ক্ষা দমন বা ত্যাগ করিতে পারিতেন না। এ কথাটি ইহাতেই সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। (২) প্রতাপ সর্ব্বদাই চন্দ্রশেখরের আজ্ঞাবহ। 'চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন।' ইহাতে যেন গ্রন্থকারের আভাস রহিয়াছে যে, প্রতাপ চন্দ্রশেখরের ইচ্ছাক্রমেই বিবাহ করিয়াছিলেন। (৩) প্রতাপ ভাবিয়াছিলেন, বিবাহ করিলে হয়ত শৈবলিনীকে ভুলিতে পারিবেন, এবং ভুলাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। আরও মনে করিয়াছিলেন যে, এতদ্দ্বারা শৈবলিনীর মনে প্রতাপ পাইবার আশা একেবারে উৎপাটিত হইবে, কিম্বা তৎপ্রতি তাঁহার আসক্তি কমিয়াছে ভাবিয়া শৈবলিনীর প্রতাপাসক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইবে। চন্দ্রশেখরের হিতের জন্য, যাহাতে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা তাঁহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। বোধ হয়, এই সব চিন্তা একত্রিত করিয়া প্রতাপ এই বিবাহ করিয়াছিলেন। তবেই বলিতে পারি, প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিয়াছেন—চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য। কিন্তু কারণ যাহাই থাকুক, তাহা প্রতাপের পক্ষে; রূপসীর পক্ষে ত এ সব কিছুই ছিল না ? তবে প্রতাপ কিরূপে রূপসীকে অক্ষুব্ধচিত্তে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ? সাম্যবাদী কঠোর নীতিতত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহার উত্তরে আবার অনেকেই বলিতে পারেন, "তাহাতে দোষ ? প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসিত বলিয়া যে রূপসীকে ভালবাসিত না, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিলে ? প্রতাপ সাহেবের চিত্র নহে, বাঙ্গালীর চিত্র। প্রতাপের জন্ম সেই দেশে, যেখানে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই কল্পনা হইতে, যেখানে কুন্দ ও সূর্য্যমুখী ভ্রমর ও রোহিণী, নন্দা ও রমা একই ব্যক্তির প্রণয়পাত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকারীকে অন্য কোন উত্তর না দিয়া একটি গল্প বলিব। গল্পটির সারাংশ কোন ইংরাজী পুস্তক হইতে গৃহীত। কোনও এক ব্যক্তি পরোপকারের জন্য আত্মহত্যা করিয়াছিলে। একদিকে আত্মহত্যা মহাপাপ, অন্যদিকে পরোপকার মহাব্রত, এই দুইটির কোন্‌টি সমধিক প্রবল হইবে জানিতে না পারিয়া, ধর্ম্মরাজ পাপের খাতায় তাঁহার এই কার্য্যটি উঠাইলেন। কিন্তু যাই তাহা লেখা হইল, অমনি এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়া সমস্তই মুছিয়া গেল। বোধ হয় এ গল্পটি শুনিয়া প্রশ্নকারীগণ নিরুত্তর থাকিতে পারেন। যদি বাস্তবিকই প্রতাপ বিবাহ করিয়া কোন দূষণীয় কাজ করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণগুলি ভাবিয়া দেখিলে, সে দোষের ভাগ মুছিয়া যায় না কি ?

চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য;—আর একটি কথা যদি তোমরা বলিতে দেও, তাহা হইলে বলি,—প্রতাপ জীবনত্যাগ অপেক্ষাও যে দুর্দ্দমনীয় শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, তাহাও করিয়াছিলেন, অনেকটা চন্দ্রশেখরের জন্য। এ কথাটিতে বোধ হয় প্রতাপের মহত্ত্ব বিন্দুমাত্রও স্খলিত হয় না; চন্দ্রশেখরের জন্য শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগে তাঁহার যথেষ্ট মহত্ত্ব ও যথেষ্ট ইন্দ্রিয়বিজয়ের পরিচয় রহিয়াছে। কঠোর নীতিতত্ত্বজ্ঞগণ এ কথা শুনিয়া আমাকে কি বলিবেন জানি না। কিন্তু আমাদিগের নিকট এই কথাটিতেই যেন প্রতাপ-চরিত্রের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, ইহার জন্যই প্রতাপ-চরিত্র আমাদিগের মনোরঞ্জন করিতে এত সমর্থ হইয়াছে।

ইহাতেও কি চন্দ্রশেখরের ঋণ পরিশোধ হয় নাই? এমন কৃতজ্ঞতা কি আর কোথাও দেখিয়াছ? এমন এক বৃত্তির অধীন সমস্ত জীবন-কার্য্য কখন কি দেখিয়াছ? এমন পরার্থে জীবনের সর্ব্বসুখবিনিময় কখন কি দেখিয়াছ? প্রতাপ মানুষের মধ্যে বীরত্বে অদ্বিতীয় নয় কি? এ প্রতাপকে আমরা কিরূপে প্রশংসা করিব? আর—আর সেই প্রতাপের প্রণয়? সেই পূর্ণ উদ্দীপিত অথচ সংযত—সেই প্রগাঢ়, হৃৎপিণ্ডে মিশ্রিত, অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ প্রণয়? তাহা কি বলিবার? তাহা কি বুঝাইবার? কবি ভিন্ন অন্যে তাহা বুঝাইতে পারে না। আমাদিগের কবিবর তাহা একস্থলে প্রতাপের দ্বারা এইরূপে বুঝাইয়াছেন। প্রতাপের তদানীন্তন অবস্থা, প্রতাপের তাৎকালিক ভাব, আর তাঁহার সেই ভাষার আবেশ—একত্রিত হইয়াই সেই ভাবের ছায়ামাত্র দেখাইতে পারিয়াছে। সে প্রেমের চিত্র ধারণা করিতে, স্মৃতিপথে সর্ব্বদাই প্রতাপের সেই ভাষাই উদিত হয়।

"কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না; এই মৃত্যুকালে আপনি সে কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ

করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই, তাই মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

এ ভাষার আর ভাষান্তর হয় না। প্রতাপ মরণেও মহাবীর।

এখন রমানন্দস্বামীর মত আমারাও প্রতাপের সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারি,—'তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী।' রমানন্দস্বামীও প্রতাপকে বলিয়াছিলেন—'এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ড মাত্র।' 'প্রার্থনা করি জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।'

"তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও। লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।" আর তোমার আবাসস্থলটি বঙ্গধামে পবিত্র হইয়া অক্ষয়রূপে বিরাজ করুক—"চন্দ্রশেখর" সাহিত্যরাজ্যে অমরত্ব লাভ করুক।

৪। অন্যান্য চরিত্রাবলি।

গ্রন্থ মধ্যে নানা প্রকারের চরিত্র সন্নিবেশিত থাকিলে, তাহা বৈচিত্র জন্য পাঠকবর্গের সমধিক প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল চরিত্রই

* এই কথাটিতে সেই শপথের কারণ ব্যাখ্যাত দেখিতে পাই। এখন সরলাতেও প্রতাপ বীর। এমন করিয়া মন খুলিতে কয়জনে পারে?

কিছু মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা জন্য কল্পিত হয় না—ফলতঃ অতি অল্পই তজ্জন্য সৃষ্ট হইতে দেখা যায়। অপরগুলির কার্য্য গ্রন্থভেদে বহুবিধ হইয়া থাকে। কোনটা বা মূলচরিত্র বিকাশের জন্য প্রথমে কল্পিত হইয়া শেষে অপর কোন উদ্দেশ্য সাধন বা নূতন কোন সৌন্দর্য্যের অবতারণ করে। নবাব ও ইংরাজ লইয়া কারবার করিতে গ্রন্থকারের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,—অর্থাৎ রাজনীতির কোন সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার জন্য ইহা রচিত হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা ব্যাখ্যাযোগ্য মনে করিলাম না। নবাব-চরিত্র ও ইংরাজ চরিত্র, আমাদিগের সমালোচ্য বিষয় নহে। আমরা এইখানে কেবল দুইটি অত্যুজ্জল চরিত্র সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সে চরিত্র দুইটি—রমানন্দস্বামী ও দলনী।

দুই এক কথাতেই রমানন্দস্বামীর উন্নত চরিত্রটি বড় সুন্দর খুলিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম, তাঁহার দয়া অপরিসীম, তাঁহার পরহিতৈষণাও অপরিসীম। তিনি কাব্য মধ্যে কেবল চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের সম্মুখেই বিরাজ করিয়াছেন—তিনি চন্দ্রশেখরের গুরু। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সত্য, কিন্তু প্রতাপের সহিত তাঁহার শেষ দিনের কথাবার্ত্তায় তাঁহার অপরিসীম মানব-হৃদয়-জ্ঞান দেখিয়া বোধ হয় যেন, তিনিও সংসারে এক দিন প্রণয়ী ছিলেন। সেই সঙ্কীর্ণ প্রণয়ই তাঁহার এই বিশ্বব্যাপিনী প্রেমের কারণ স্বরূপ। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে রমানন্দস্বামীই সে প্রণয়ের যথা উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণয়ের নিকট চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের প্রণয়ও অবনত হইয়া পড়ে। প্রণয়ের চরম উৎকর্ষ, চন্দ্রশেখরের প্রণয়েরও পরের স্তর, রমানন্দস্বামী দেখাইয়া গিয়াছেন। এই রমানন্দস্বামী সম্বন্ধে আর যাহা বলিবার তাহা অন্যত্র বলিতে ইচ্ছা রহিল। এ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমরা অনেক স্থানে অনেক ভাবে দেখিয়াছি ও ভবিষ্যতেও দেখিতে ভরসা রাখি।

শৈবলিনীর প্রণয়ে যেরূপ প্রণয়ের উগ্রমূর্ত্তিটি প্রদর্শিত হইয়াছে, দলনীর প্রণয়ে আবার সেইরূপ প্রণয়ের শান্ত ও মোহনচ্ছবি দেখান হইয়াছে। একটিতে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের খরতর প্রভা দেখিতে পাই, অন্যটিতে শারদীয় পূর্ণিমার বিমল, স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখিতে পাই। একটির প্রণয় বাধা পাইয়া উগ্রভাব ধরিয়াছিল, অন্যটির প্রণয় বাধা না পাইয়া নীরবে স্রোতস্বিনীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল। একটির প্রণয় কলুষিত, অন্যটির প্রণয় পবিত্র।

এইরূপ সর্ব্বথা বিপরীত ভাব লইয়া দলনী বেগম চন্দ্রশেখর গ্রন্থের একটি অতি অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে।

৫। ভাষা—বর্ণনা—ঘটনা—মন্তব্য।

চন্দ্রশেখরের ভাষা সম্বন্ধে এখন কিছু বলা হইবে না। চন্দ্রশেখরের বর্ণনাগুলি অতীব মনোহর। যেরূপ মনোহর, সেইরূপই আবার ইহার সংখ্যাও অধিক। প্রায় ইহার প্রত্যেক পাতায় কবির সেই বিস্ময়কর বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানেই একটি হৃদয় বিচলনক্ষম ঘটনা পড়িয়াছে, সেইখানেই আমরা ততোধিক হৃদয়মুগ্ধকর বর্ণনার সমাবেশ দেখিয়াছি। উপক্রমণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার শেষ পর্য্যন্ত সেই বর্ণনায় পরিব্যাপ্ত। এরূপ মনোহর বর্ণনার আতিশয্য তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থে আছে কি না সন্দেহ। ইহার কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টি উদ্ধৃত করিব?

চন্দ্রশেখরের ঘটনাও অসংখ্য; ইহার সমস্ত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা তন্মধ্যে এই কয়েকটি ঘটনায় বিশেষ কবিত্ব দেখিতে পাই:—(১) শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ (চন্দ্রশেখরের গৃহ পরিত্যাগের পর) (২) শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের গঙ্গাবক্ষে শপথ (৩) শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত (৪) শৈবলিনীর উন্মত্ততা। এই শেষোক্ত ঘটনাটী সাধারণ দৃষ্টিতে যেরূপই প্রতীয়মান হউক না কেন, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে ইহার কবিত্বে বিস্মিত হইতে হয়। শৈবলিনীর হৃদয় প্রতাপে পূর্ণ—যখন সেই প্রতাপকে সে জোর করিয়া হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিল, তাহার উন্মত্ততা প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইয়া পড়িল। প্রতাপাসক্তি বিদূরিত হইয়া চন্দ্রশেখরে ভক্তি ও প্রণয় হইবার অগ্রে এটি না হইলে একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া পড়িত। ইহাতে প্রতাপাসক্তিও বেশ খুলিয়াছে আবার চন্দ্রশেখরে ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিবার স্বাভাবিকতাও বেশ প্রমাণ করিয়াছে। উন্মত্ততার পরে যেন শৈবলিনীর নূতন জীবন আরম্ভ হইল। আর সেই উন্মত্তকালীন প্রলাপেও কবির অসাধারণ দার্শনিক প্রতিভা প্রকাশিত দেখা যায়। শৈবলিনীর উন্মত্ততার প্রকৃতি ও কারণ সেই প্রলাপে অস্ফুটভাবে পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

"চন্দ্রশেখর"এ মন্তব্য সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই।

চন্দ্রশেখর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কাব্য সম্বন্ধে দুইরূপ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। একরূপ,কাব্যচিত্রিত চরিত্রাবলীর মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব জন্য—অন্যরূপ, সেই চরিত্রাবলীর উদ্দেশ্য ও লিপিচাতুর্য্য জন্য। একরূপ, কাব্যের—অন্যরূপ কবির। প্রথম প্রকারের প্রশংসাকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক প্রকারের প্রশংসা, জগতের অসীম, অনন্ত, সৌন্দর্য্যভাণ্ডার হইতে ভাল দেখিয়া সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া নয়নাভিরাম একটি সুচিত্র অঙ্কন জন্য—অন্য প্রকারের প্রশংসা, সসীম, নির্দ্দিষ্ট ও পরিমিত উপকরণ লইয়া একটি অদ্ভুত সৌন্দর্য্য চিত্রণ জন্য। দ্বিতীয় প্রকারের প্রশংসাকেও আবার দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক প্রকারের, যথন সেই উদ্দেশ্য বা অভীপ্সিত বিষয়টিই কোন এক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি (এখানে ইহা প্রথম প্রকারের দ্বিতীয় বিভাগের সহিত মিলিয়া গেল—কারণ ইহাকে অবশ্যই পরিমিত উপকরণ লইয়া কাজ করিতে হইবে) অন্য প্রকারের, যথন সেই উদ্দেশ্য এই মানব জীবনের কঠিন সমস্যাগুলির বিশদ ব্যাখ্যা। এই বিভাগে আমরা কেবল মুখ্য লক্ষ্যটিই গ্রহণ করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে কাব্যে দুই প্রকারের কথাই মিশ্রিত থাকে। তবে, যেটি মুখ্য ও উজ্জ্বল, আমরা একমাত্র তাহাকেই গ্রহণ করিয়া এইরূপ বিভাগ করিলাম। এখন আমাদিগের কথাটি তবে এইরূপ দাঁড়াইল। কাব্যে তিন প্রকারের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। এক প্রকারের—অসীম, অনির্দ্দিষ্ট, অনন্ত উপকরণ হইতে আহরণ করিয়া, নেত্রমুগ্ধকর ও উন্নত চরিত্র সৃষ্টি—এক প্রকারের, পরিমিত, নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবিশিষ্ট উপকরণ লইয়া কোন এক নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি—এক প্রকারের অসীম, নির্দ্দিষ্ট ও পরিমিত উপকরণ লইয়া মানবজীবনের কোন কঠিন সমস্যার ব্যাখা। "স্বর্ণলতা," "বিষবৃক্ষ," "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতি এই শেষোক্ত প্রকারের উদ্দেশ্যে লিখিত। তবে "স্বর্ণলতা"র উদ্দেশ্য অতি স্থূল—উদ্দেশ্যসাধনে গ্রন্থকার সম্যক্ সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই তাহার প্রশংসা—নতুবা ইহাতে মানব-জীবনের কোন কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যাত হয় নাই। "বিষবৃক্ষ" ও কৃষ্ণকান্তের উইল"ই এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসদ্বয়। তন্মধ্যে আমরা "কৃষ্ণকান্তের উইল"কেই অথবা "কৃষ্ণকান্তের উইলের" রচয়িতাকেই বেশি প্রশংসা করি; কারণ ইহার উপকরণ অতি সামান্য ও

উহার সমস্যাটিও অপেক্ষাকৃত জটিল প্রকৃতির। দ্বিতীয় প্রকারের কাব্য মধ্যে "কপালকুণ্ডলা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিন চারিটি বনফুল লইয়াই ইহাতে একটি অপূর্ব্ব মালা গ্রথিত হইয়াছে। শাদার উপরে এমন সুন্দর শাদা ও মনোমুগ্ধকর কার্য্য, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে আর দেখা যায় না। আর, প্রথম প্রকারের কাব্য মধ্যে "চন্দ্রশেখর" অতি উচ্চ, অথবা অতি উচ্চই বা কেন বলি, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। ইহার চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ, কাব্য জগতে অতুল্য সামগ্রী। এরূপ মহৎ ও উন্নত গৃহীর চরিত্র তাঁহার গ্রন্থ মধ্যেও আর পরিদৃষ্ট হয় না।

আমরা এই শ্রেণী বিভাগ করিয়া একরূপ দায় হইতে উদ্ধার পাইলাম। আমরা কখন 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়াছি, কখন "চন্দ্রশেখর"কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হয় নাই। এখন তাহার কারণ স্পষ্টীকৃত হইল না কি?